অনুরূপা

অনুরূপা

শ্রীগোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বিহার সাহিত্য ভবন (প্রাইভেট) লিঃ
৩, ভবানী দত্ত লেন ॥ কলিকাতা-৭

বিহার সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ, ৩, ভবানী দত্ত লেন,
কলিকাতা—৭ হইতে শ্রীশক্তিকুমার ভাদুড়ী কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ়—১৩৬৪
ই—১৯৫৭

মূল্য : তিন টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা—৬ হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মণ্ডল কর্তৃক মুদ্রিত।

যার সাহায্য প্রতিনিয়ত না পেলে এ লেখা হয়তো শেষ হতোনা আমার, সে হলো পরম স্নেহাস্পদা ভগ্নী শ্রীমতী মায়া মুখোপাধ্যায় এবং যাঁর অকুণ্ঠ সহযোগীতায় বইটি প্রকাশ হতে চলেছে তিনি হলেন শ্রীযুক্ত শক্তিকুমার ভাদুড়ী। মাঝখানে আছেন আবাল্য-সুহৃদ শ্রীযুক্ত সুধেন্দু বিশ্বাস, স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়ে যিনি শক্তিবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন। এঁদের প্রত্যেকের সহস্র শুভ কামনা করি।

অনুরূপার রচনাকাল বৈশাখ থেকে আশ্বিন, সন তেরশো তেষট্টি।

৪ঠা আষাঢ় ১৩৬৪
কলকাতা ১৪

গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

উৎসর্গ

পরম পূজনীয় পিতৃদেব
৺পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়
স্মরণে

এক

অনীশের কথা
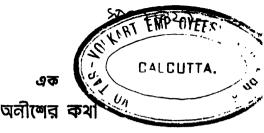
সুনন্দন মজুমদারকে প্রথম দেখি গত ডিসেম্বরের শেষের দিকে, একাডেমি অফ ফাইন আর্টসের চিত্র-মেলায়। দিনটা মনে আছে বৃহস্পতিবার, সময়টা বৈকালি রোদ মুছে সন্ধ্যে হয় হয়, তারিখটা খ্রীস্টমাস ইভ কি তার একদিন আগের।

এই সময়টা, পৌষালি শীতের এই উৎসব মরশুমে, চৌরঙ্গীর এ-কোণে ও-কোণে পর পর ক'টি চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন প্রতিবারই হয়ে থাকে। আমি তার একটিতে অন্তত হাজির থাকি দর্শক রূপে। তাই বলে ছবির বিষয়ে আমি একজন সমঝদার কেউ, একথা মনে করলে ভুল করা হবে। চিত্র কলার ত্রিবেণী মূল তিনটি ধারায় বয়ে আসছে,—তার একটিতে প্রাধান্য পেয়েছে ছন্দ, অন্যটিতে রূপ, আর তৃতীয়টিতে সদৃশতা,—প্রাথমিক এই তথ্যটুকুই শুধু জানি। নইলে অঙ্কনরীতির বিভিন্ন স্কুল সম্বন্ধে জটিলতর প্রশ্ন তুললে নিরুত্তর হয়েই থাকতে হয় আমায় সেখানে, নানান দেশের শিল্পীকুলের মেজাজের তারতম্য নিয়ে সূক্ষ্ম তর্ক উঠলেও নীরব থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই আমার।

তবে মধ্যবিত্ত বাঙালী মাত্রেরই রসোপলব্ধির কিছুটা অনায়াস পটুত্ব আছে, এবং সে উত্তরাধিকার থেকে আমিও বঞ্চিত নই। সেই কারণেই

প্রদর্শনীতে ভিড় করি ছবি দেখতে,—পুরোনো গুরুরা নতুন কি দিলেন চেষ্টা করি বুঝতে, নতুন ভগীরথেরা কোন্ জোয়ারের প্রতিশ্রুতি আনছেন, চাই সে কথা জানতে। চাই বলেই যে পাই তা তো নয়ই! বহু দুরূহ ছবি চোখের দরজা পেরিয়ে মনের মনি-কোঠায় পৌছুতে পারে না, কত গুণীর ওপর অজান্তে অবিচার করে বসি, কত ক্ষেত্রেই না ভুল বিচার করি। তাই যে ছবি দেখে রীতিমতো উঁচু ধারণা নিয়ে রাত্রে বাড়ি ফিরি তাকেই হয়তো দেখি সকালের স্টেটস্‌ম্যানে কলাসমালোচকের কলমে ফালা ফালা হতে। তবু একটা আশ্বাস এই, দর্শকদের যদি মাথা গুনতি করে হিসেব নেওয়া হয় দলে ভারী আমরাই। অধুনা আমল পাই না, অথচ শুনি কলকাতায় প্রদর্শনীর আদি পর্বে গগনেন্দ্র প্রমুখ শিল্পাচার্যেরা স্বয়ং নাকি ঘুরে বেড়াতেন আমাদের তুল্য ভিড়ের দর্শকদের ছবি চেনাতে; সত্যিকারের দ্রষ্টা বানাতে।

পয়লা সারির জহুরীরাও আছেন বৈকি! যাঁরা একেবারে পুরো আক্ষরিক অর্থে চিত্ররসিক; বিদগ্ধ রূপদর্শী! তবে সম্প্রদায় হিসেবে এঁরা আজও সংখ্যালঘু।

আমাদের এবং এঁদের এই দুটি দলের কথা বাদ দিলে তৃতীয় গোষ্ঠীও আছেন একটি। তা তাঁরা কোথায় বা নেই? রণজি স্টেডিয়মে ভারত বনাম কমনওয়েল্‌থের টেস্টম্যাচ থেকে মিউ এম্পায়ারে শ্রীমতী শান্তার ভরতনাট্যম-পর্যন্ত এবং আরও বহুতর স্থানেই এঁদের পদধূলি নিয়ম করে পড়ে থাকে। কিংবা ভুল বললুম, হয়তো ধুলো-কাদা এঁদের জুতোয় সচরাচর লাগে না। কিন্তু, থাক সে কথা!

ভবানীপুরের এক ছাত্রীকে পাঠ দিয়ে সন্ধ্যের পর ফিরি। কদিন ধরে রোজ চোখে পড়েছে, যাদুঘরের ভুতুড়ে বাড়িটা ছমছমে ভাব ঘুচিয়ে ফ্লাড লাইটের জড়োয়া গয়নায় যথাসাধ্য সেজেছে গুজেছে। সামনের

ফটকে উঁচুতে নহবৎ বসেছে, ইমন কল্যাণের সুরে সানাইয়ের এক আধটা টুকরো তানও চলতি ট্রামের শব্দ ছাপিয়ে কানে এসে পশেছে। কাগজে ছবি দেখেছি একদিন—রাজ্যপাল উদ্বোধন করছেন প্রদর্শনীর, সঙ্গে নেপালের মহারাণী, পাশে লেডি রাণু; কর্তাব্যক্তি আরও কে কে যেন!

ভেবে রেখেছিলুম সম্ভব হলে বৃহস্পতিবার বিকেলে চেষ্টা করবো আসার, ওদিনে অবসর খানিকটা মেলে। জয়ন্তী এখানে নেই, সুতরাং একাই আসবো। তখন কি জানি, ছবি দেখা আমার অদৃষ্টে সেদিন লেখা নেই?

মিউজিয়মের ভেতরে ঢুকে ক'পা এগোলেই বাঁদিকে চওড়া সিঁড়ি। ওপরে উঠলুম। কিন্তু ঐ পর্যন্তই! দর্শনী জমা দিয়ে ঢুকতে যাচ্ছি ভেতরে, জামার হাতায় টান পড়লো।

ফিরে দেখি সমীর। সমীর চৌধুরী, আমার এককালের ঘনিষ্ঠ সহপাঠী, অধুনা নিকটতম আত্মীয়। সঙ্গে আরও ত্বজন ভদ্রলোক।

বললুম, তুমি?

—বলছি। এসো, এঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

ওর গলায় ঈষৎ উত্তেজনার আভাস পেলুম। ভঙ্গিটা আমার চেনা। বোধ হয় কোন ছবি নিয়ে তর্ক চলছিল ওদের। বরাবরই দেখে আসছি, অতি তুচ্ছ বিষয়েও আর পাঁচজনের সঙ্গে চট করে একমত হতে কোথায় যেন বাধে সমীরের। ওর নিজের মতে এইটেই ওর বৈশিষ্ট্য। কলেজের সহপাঠিনীরা আড়ালে নাকি ডাকতো ওকে তর্কচঞ্চু বলে,—ওরই এক বিশিষ্ট বান্ধবীর মুখে শোনা। তবে সেটা ঐ তর্কপ্রিয়তার জন্তেই, না কি ওর ওপরের ঠোঁটটা অল্প উঁচু বলে, অথবা এই দুটো কারণই জড়িয়ে, এতদিন পরে সঠিক বলা মুস্কিল!

আমি ওর সঙ্গি তুজনের দিকে চেয়ে হাসি বিনিময় করলুম। একজনকে আপনারা অনেকেই চিনবেন। বাংলা দেশের ক্রীড়া জগতের দিক্‌পাল বিশেষ, স্বনামধন্য বক্সার শ্রীশঙ্কর পাল। অন্যজনের নাম গোড়াতেই বলেছি, সুনন্দন মজুমদার। কিছুদিন ধরেই সমীরের মুখে এঁর নাম প্রায় শুনছি, ওদের ট্রেডিং এজেন্সির নতুন পার্টনার। আমার পরিচিতিটাও বেশ আকর্ষণীয় ভাষায় পেশ করলে সমীর ওঁদের তুজনের কাছে। বেসরকারি কলেজে ইতিহাসের মাস্টারি করি, ওর কথায় এই প্রথম জানলুম, স্যর যতুনাথের সঙ্গে আমার প্রভেদটা নেহাৎই শুধু বয়সের।

আলাপ পরিচয়ের বিরতি ঐ ভূমিকাটুকুতেই, কারণ মুহূর্ত পরেই সমীর ওদের ছেঁড়া তর্কের সুতোয় নতুন করে গিঁট দিলে। বোধ হয় শঙ্কর পালের সঙ্গেই আলোচনা। তিনি দেখলুম কিছু অপ্রতিভ হয়ে পড়েছেন সমীরের আকস্মিক উত্তেজনা দেখে। খুবই স্বাভাবিক! উঠতি-নামতি প্রায় প্রত্যেকেই কৌতূহলী দৃষ্টি ফেলছিলেন আমাদের দিকে; মহিলাদের চোখে তো তত্নপরি প্রচ্ছন্ন কৌতুক-আভা।

বিষয়টা অথচ মামুলি। তেল-রঙ ছবির টেকনিক কোথায় প্রথমে চালু হয় তাই নিয়েই বিতণ্ডা। পনেরো শতকের ফ্লেমিশ শিল্পী ভ্যান আইক ভ্রাতৃদ্বয় প্রথম তৈল-চিত্র নির্মাণ করেন এমনি একটা কথা চলিত আছে। শঙ্কর বাবু বোধ হয় তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। সমীর বলছে, ও শুনেছে কোন্ জৈন কাহিনীতে আছে, তুহাজার বছর আগেও তেলরঙ ছবির অঙ্কনরীতি অজানা ছিলনা এদেশে।

আমার এ বিষয়ে একটু বক্তব্য ছিল। কিন্তু তার আগেই সুনন্দন মজুমদার কথা বলে উঠলেন। বললেন, কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে তৈলাক্ত রঙে প্রতিকৃতি আঁকার কথা স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত আছে।

চার লাইনের একটি শ্লোকও নিপুণ উচ্চারণে উদ্ধৃত করে শোনালেন, যার সামান্য অংশ মনে পড়ছে, "অঙ্গে চ প্রতিভাতি মার্দবমৃদম্ স্নিগ্ধপ্রভা-বাচ্চিরম্।" অনুতাপে দগ্ধ, বিরহে কাতর রাজা দুষ্মন্ত প্রিয়ার ছবি আঁকছেন। স্নিগ্ধ কথাটার অর্থ স্নেহপদার্থ বা তেল জাতীয় দ্রব্য ছাড়া আর কিছুই নয়, যেহেতু সম্পূর্ণ মানে দাঁড়াচ্ছে তৈলাক্ত বর্ণের শক্তির জন্যেই স্থায়ী ভাবে ধরা পড়ছে শকুন্তলার সৌন্দর্য।

তৈরি উদাহরণ পেয়ে সমীর খুব খুশি। কিংবা খুব হয়তো নয়, কারণ এমন লাগসৈ উদ্ধৃতিটা ওর স্বমুখে উচ্চারিত হলোনা তো! শঙ্কর পালের দিকে ফিরে বললে, শুনলে? বলেছিলুম না তোমায়, বণ্যেরা বনে সুন্দর আর বক্সারেরা শুধু রিংএর মধ্যে?

আপত্তিকর মন্তব্য সন্দেহ কি! শঙ্কর পাল গুম হয়ে রইলেন কয়েক সেকেণ্ড, তারপর সমীরের দিকে তাকালেন। ওঁর দুচোখে আমাদের সেই আদিম পূর্ব পুরুষের ছায়া পড়লো, যা এ যুগে শুধু মুষ্টিযোদ্ধা আর কুস্তিগীরদের চোখেই কদাচ-কথনো দেখা যায়।···কিন্তু না, স্পোর্টস্ম্যান-দের মানসিক স্থৈর্য্য বাস্তবিক অনুকরণযোগ্য! হঠাৎ সপ্রতিভ হেসে সমীরের ডান হাতখানা ধরে উনি অভিনন্দন জ্ঞাপক ঝাঁকুনি দিলেন। সামনের দুটি দাঁত আলো পড়ে ঝকঝক করে উঠলো। দেখি সোনা দিয়ে বাঁধানো। তা হোক, হাসিটা কিন্তু অকৃত্রিম বলেই বোধ হলো।

আমি এতক্ষণে সুনন্দন মজুমদারের দিকে দৃষ্টি ফেরালুম। বয়সে সমীর আমার চেয়ে বছর কয়েক বড়ই হবেন। লম্বা একহারা বলিষ্ঠ গঠনের শরীর, মুখশ্রী পুরুষোচিত। বর্ণটি আর একটু উজ্জ্বল হলে রীতি-মতো রূপবান বলা চলতো। কপালের দুপাশের চুল পিছন দিকে ঠেলে ঠেলে ভাগ্য-নদী প্রশস্ততর হচ্ছে ক্রমে। পরিচ্ছদ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন

মনে হলো ভদ্রলোককে। নাবিক-নীল রঙের ভিনিশিয়ান সার্জের স্যুটটি সম্পূর্ণ নিভাঁজ, টাইটি সুদৃশ্য, চুলগুলি পরিচ্ছন্ন ভাবে ব্রাশ করা। সিঁড়ির আলোটা তেমন জোরালো নয়, নইলে জুতো জোড়ার চকচকে পালিশেও ছটা লাগতো নিশ্চয়। আর আবছা একটি মনোরম সুগন্ধে আশপাশের জায়গাটি যে ঝিমঝিম করছে বুঝতে দেরি হয়না, তারও উৎস নিহিত ওঁরই বুক পকেটের কোণা-উঁচু রুমালে।

সুনন্দন মজুমদার অনুভব করলেন আমি ওঁকে যাচাই করছি। চোখা-চোখি হতে ঈষৎ হাসলেন, বললেন, অতঃপর আপনার ছবি দেখা এখানেই ইতি। চলুন, বাইরে যাই, পরিচয়টা পাকা হোক।

খুব যে আপত্তি ছিল তা নয়, কথা কইতে কইতে নেমেও এসেছি আধাআধি। বললুম, বরং আপনারাই উঠুন না আর একবার ; অধিকন্তু ন দোষায়।

সমীর বাধা দিলে, ক্ষেপেছো? পুরো ছ সপ্তা পরে আজ বিকেলে একটু ছুটি মিলেছে। কাল থেকে আবার মাথা তোলার ফুরসৎ পাব না।

তা জানি আমি। এটা ওদের বার্মা থেকে সীড্ পটেটো আমদানির সিজন্। নভেম্বর থেকে জানুয়ারি স্নানাহারের সময় মেলেনা ওদের। আপত্তি টিকলোনা। সুতরাং মিউজিয়মের সদর পেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালুম চারজনে।

ওপরে সানাইয়ে ভারী মিষ্টি একটা ধূন বাজাচ্ছে। মুখ তুলে চেয়ে সমীর বললে, আর্ট একজিবিশনের ফটকে নবৎ বসানোর কি সম্পর্ক আমি কিন্তু বুঝতে পারি না, এ কি বিয়ে বাড়ি না কি?

—যাই বলো বাজাচ্ছে কিন্তু বেশ! সানাইয়ের সুর কানে গেলেই মনে যেন উৎসবের আমেজ লাগে। আর, আজ যদিও সব জায়গায় নিপাত্তা হয়ে শুধু বিয়েবাড়ির সামিয়ানার এক কোণে টিকে রয়েছে কোন

রকমে, একদিন কিন্তু বহু উৎসবেই সানাই ছিল অপরিহার্য অঙ্গ। নইলে আসর জমতো না!

শঙ্কর পাল বললেন, কেন অল ইণ্ডিয়া রেডিও তো সানাইয়ের কদর করছে খুব। সকালে স্কিপিং সেরে ঘড়ি মেলাই। রেডিও খুললেই গোড়ার পাঁচ মিনিট সানাই শোনা কম্পালসারি।

সুনন্দন মজুমদার মন্তব্য করলেন, বিয়ে বাড়ির কথাই যদি তুললেন, এবার তো কলকাতায় দেখছি এ্যামপ্লিফায়ার ছাড়া অন্য সব বাজনাই বরবাদ। তা সে বিয়ে বাড়িই কি আর পুজো বাড়িই কি!

—হ্যাঁ, আর ঐ কি যে এক গান উঠেছে 'দানার ওপর দানা কিছক দানা।' আর কি গান নেই বাজারে? শঙ্কর পাল যোগ করলেন।

—উঁহু, কিছক দানা নয় ইছক দানা। সমীর শুধরে দিলে। হেসে সকলে।

শঙ্কর পাল ওখান থেকেই বিদায় নিলেন, এন, সি, সি ক্লাবে কার সঙ্গে যেন এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রয়েছে।

সুনন্দন মজুমদার প্রস্তাব করলেন, চলুন কোথাও ঢুকে বসা যাক খানিক। পেটে কিছু না পড়লে জমবেনা ঠিক মতো।

সমীর সমর্থন করলে।

কাছেই আমার প্রিয় ছোট্ট একটি রেস্তোরাঁ ছিল, তার ঠিকানা জানালুম।

মজুমদার বাতিল করলেন। বললেন, না অত কাছে নয়, একটু হাঁটি চলুন তার আগে। বছর চারেক বাদে বড়দিনের মরশুমে কলকাতায়

রয়েছি, একটু ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করছে—তা আপনারা যতই কেন গেঁয়ো ভাবুন!

ওঁর মত পরিবর্তনে বিস্মিত হয়ে বললুম, প্রস্তাবটি মনোরম সন্দেহ নেই তবে জমানা বদলে গিয়েছে, কলকাতার বড়দিনে আর আগেকার সেই জৌলুশ পাবেন না। সমীরের দিকে ফিরে বললুম, কিন্তু তোমার গাড়ি ফেলে তো বেশি দূর যাওয়া চলবেনা।

সমীর বাধা দিলে, দূর, গাড়ির কথা আর বোলোনা, মাসে একবার করে কারখানা না গেলে অচল। নতুন বছরের গোড়াতেই বদলে ফেলবো ওটা।

উত্তর মুখো হাঁটা দিলুম তিনজনে। সে রাম আর সে অযোধ্যা দুয়েরই কিন্তু দিন গত, বড়দিনের চৌরঙ্গীতে সে মাতন নেই আর। বড় সায়েবদের পিছু পিছু তাঁদের অত সাধের বড়দিনও কুইট ইণ্ডিয়া করেছে। নইলে পুরো একটি ঘণ্টা আগে যে দুটি ছেলেকে ফুল বিক্রী করতে দেখে গিয়েছি গ্র্যাণ্ডের তলায় এখনো তাদের সেই একভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়? বোধ হয় একটি করে স্তবকও হস্তচ্যুত হয়নি কারও।

সমীর বললে এ আর দেখছো কি? ফুলের স্বর্গ খোদ নিউ-মার্কেটেই খদ্দেরের আকাল চলেছে। কাস্টমসের দুজন মাদ্রাজি অফিসারকে ডালি পাঠাবো বড়দিনে, তাই গিয়েছিলুম মুখুজ্জে কোম্পানির কাছে কিছু গোলাপ আর চন্দ্রমল্লিকার অর্ডার দিয়ে রাখতে, অবস্থা যা শুনলুম, তাজ্জব। বলে, আর কমাস দেখে কার্মাটারের বাগান আধখানা বেচে দেবে ওরা।

এইটুকু পথ পার হতেই জন তিনেক ব্যক্তি বশম্বদ ভঙ্গিতে গুণ গুণ করে গিয়েছে কানের পাশে···ইউরোপিয়ান গার্ল···সুইট সেভেনটিন্···।

এ হেন মচ্ছবের দিনেও সন্ধ্যার দেবীদের পাণ্ডারা হন্যে হয়ে খদ্দের খুঁজে বেড়াচ্ছে, আশ্চর্য বৈকি !

তবে দোকান-পশার রেস্তোরাঁগুলো অবশ্য ওরই মধ্যে সাজিয়ে গুছিয়ে বসেছে যতটা সম্ভব। ওপরে নিওন সাইনের নরম আলো, রঙীন ফানুস-বেলুন, শো-কেসে খ্রীস্টমাস ট্রি।

আর বড়দিন করছে ক'টি নাবিক ছেলে। বুঝি কোন বিদেশী জাহাজ আজকালের মধ্যে নোঙর ফেলেছে বন্দরে! ছোট ছোট গুটি চার পাঁচ দল এরই মধ্যে অতিক্রম করে গিয়েছে আমাদের, মদমত্ত পায়ে মার্চ করে। গলায় সুরও তুলেছে কেউ কেউ—যার বাংলা তর্জমা হলো ছুনিয়ার তাবৎ সুন্দরী কন্যা শুধু নাবিকদেরই প্রেম-রাধা।

পথ চলতে চলতে মজুমদারকে জিজ্ঞেস করলুম, কেমন দেখলেন এবারের প্রদর্শনী ?

উনি হাসলেন, এক কথায় কালিদাস 'কোট' করে ঝগড়া থামালুম, খুব এলেমদার রসবেত্তা ভেবেছেন বুঝি ? ভুল করেছেন তাহলে ! আমাদের চার পুরুষের জীবিকা ছিল টোল খুলে পণ্ডিতি করা, তথা যজন-যাজন করা। বাবাই প্রথম গোত্র ছাড়া হয়ে কলকাতা এসে আইন পড়েন, পরে পাটনা গিয়ে পশার জমান। একটু আধটু সংস্কৃত চর্চা আমাদের বাড়ির মেয়েদের মধ্যেও চলে এসেছে।

—যাই বলো, ক'বছর ধরে যেন মাত্রাহীন ভাবে ছবির সংখ্যাধিক্য ঘটানো হচ্ছে। দেওয়ালে কোনখানে ফাঁক নেই, এইটেই যেন প্রদর্শনীর শেষ কথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ক্রমশ।

বললুম, ঠিকই বলেছো। কলেজ স্কোয়ারে, প্রেসিডেন্সী কলেজের রেলিঙে পুরোনো বইএর দোকানদারেরা যেমন ভাল-মন্দ নির্বিচারে গাদাগাদি করে বই টাঙিয়ে রাখে অনেকটা সেই রকম আর কি !

—তবে দর্শক সংখ্যা যে আগের অনুপাতে ক্রমেই বেড়ে চলেছে, এটা একটা সুলক্ষণ তা মানতেই হবে।

বললুম, তা বাড়লে কি হয়। এদের মধ্যেই একটা বড় দলও রয়েছে যাদের কাছে ছবির একজিবিশনে আসাটা নিছক একটা ফ্যাশন বলেই গণ্য!

মজুমদার বাধা দিলেন, আমাকে কটাক্ষ করছেন না আশা করি। সমীর টেনে নিয়ে এলো তাই, নইলে আমি নিজে ওসব শিল্পকর্ম সত্যিই ভাল বুঝিনা। এককালে ক্যামেরার ছবিতে ইণ্টারেস্টেড ছিলুম, এই মাত্র। অর্ধেক ছবির তো অর্থই ঢুকলো না মস্তিষ্কে।

সহাস্যে উত্তর দিলুম নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনাকে কটাক্ষ করতে গেলে নিজেরাও লজ্জা রাখার স্থান পাবোনা। মনে ভাববেন না আমরাই বিশেষ এগিয়ে আছি আপনার চেয়ে, অবশ্য শিল্পীদের দোষও কম নয় কিছু। প্রায় ক্ষেত্রেই এমন সব তুরূহ আঙ্গিক ব্যবহার করতে শুরু করেছেন তাঁরা, যাতে আপনি-আমি, মানে রাম-শ্যাম-যতুরা মাথাটুকু গলাতে না পারি।

—তাহলে তো অতীব তুঃখের কথা!

—না তো কি! শুনছে কে বলুন?

কথায় কথায় এগিয়ে এসেছি অনেকটা, সুরেন্দ্র ব্যানার্জী রোড ক্রশ করে, মেট্রো পেরিয়ে প্রায় এ মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছি। সুনন্দন মজুমদার দেখলুম পায়দলে চলাটা পছন্দ করেন খুব।

সমীর তাড়া দিলে, কি হলো, চায়ের প্রস্তাবটা বাতিল হলো না কি? সামনে ব্রিস্টল। ঢুকলুম তিনজনে।

তিন প্লেট চিকেন কাটলেটের ফরমাশ দিলে সমীর। অনুসঙ্গী হিসেবে এলো মাখন-রুটি আর পর্যাপ্ত পরিমাণে স্যালাড। তারপরে চা। মজুমদার চায়ের বদলে কফি নিলেন। এধারে ওধারে কয়েকটি চেনা-চেনা মুখ। কেউ বিলিয়ার্ড খেলছেন, হুইস্কির পেগে জীবনের রং ছোপাচ্ছেন কেউ। সমীরের মুখে শুনলুম ব্রিস্টল নাকি আজকাল ফিল্ম-তারাদের বৈঠকখানা বিশেষ। ওর সঙ্গে পরিচয়ও রয়েছে দেখলুম দু-একজনের।

খানাপিনার ফাঁকে ফাঁকে টুক্‌রো-টাক্‌রা কথাবার্তা যা হলো সবই আমাদের নতুন বন্ধুটিকে কেন্দ্র করে! ছোট বড় মাঝারি বহু ফার্মের হয়ে নানাবিধ ব্যবসা করেছেন ভদ্রলোক, আর সেই সূত্রে ঘুরেছেনও অনেক স্থানে। বার্মায় ছিলেন পুরো তিন বছর, পেনাঙে কিছুদিন, তার আগে উত্তর এবং পূর্ব ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি শহরে ঘুরতে হয়েছে ওঁকে!

আমার নিজের ভ্রমণের সাধ বিস্তর, যদিও সাধ্যে কুলোয় না। তবে জয়ন্তী এসে এই দুবছরে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। এবার পুজোর ছুটিতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল পুরী, গতবারে কালিম্পঙ। অল্প-সল্প উস্‌কে দিতে লাগলুম আমি মজুমদারকে। উনিও একটু একটু করে গল্পের ঝুলির মুখ খুলতে লাগলেন। তারপরে ওয়েটার বিল নিয়ে এসে দাঁড়াতে কথা থামিয়ে তাড়াতাড়ি কাগজটা টেনে নিলেন।

সমীর বিস্মিত গলায় বললে, এটা কি হলো? নেমন্তন্ন করলুম আমি, অর্ডার দিলুম আমি, এখন বিলের দিকে তুমি হাত বাড়াচ্ছ যে বড়?

—আরে ভাই, তোমার বিল কাড়তে পারি আমি? তুমি হলে বস্‌, তোমার ফার্মে কাজ করেই না হ্যাণ্ড-টু-মাউথ করছি! এটা হলো, মানে অনীশবাবুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভারী আনন্দলাভ করলুম তারই,—

—তারই কি ? নজরানা ? আমি বললুম।

—দূর। কি যে বলেন আপনি ! তা কেন ! কথা শেষ না করেই সরবে হেসে উঠলেন উনি।

বললুম, আমার বাড়িতে একদিন শুভাগমন করতে হচ্ছে কিন্তু !

—নিশ্চয়, তবে এখন নয়। রেঙ্গুন যাচ্ছি দু তিন দিনের মধ্যে, ফিরে এলে। আর আপনার গৃহীণীও তো শুনলুম পিত্রালয়ে, মানে, সমীরদের ওখানে, তিনিও ফিরে আসবেন ততদিনে। আসল কথাটা কি জানেন, বাইরে বাইরে কাটাই, পুরুষের রান্না খেয়ে অরুচি জন্মে গিয়েছে ; আপনার ঠাকুর-বামুনের রান্না মুখে উঠবে না।

—ঠাকুর আমার ওখানেও নেই। যা করবার গৃহিণীই করেন, আর আছেন আমার মা ; তাঁর রান্না খেলে ভুলতে পারবেন না।

—তবে তো মশাই দেবলোকের বাসিন্দা আপনি ; অমৃত পাচ্ছেন এবেলা ওবেলা !

সমীর বললে, অনীশের বাড়িটাও আমার লাগে বেশ। সময় নেই অসময় নেই এরোপ্লেনের বিকট শব্দ, আর বর্ষার পরে দুমাস অত্যধিক মশা, এ দুটো বাদ দিলে আর সব ভাল। কিছু না হোক সামনে দু পাশে একটু সবুজ রং চোখে পড়ে। কলকাতার কাছেই অথচ ধরা ছোঁওয়ার যেন বাইরে।

—মানছো তাহলে এতদিনে ? কলকাতার অবস্থা যা হচ্ছে দিনে দিনে ! বছর দশেক পরে আর বাসযোগ্য থাকবে না, বিশেষ করে তোমাদের ও দিকটা তো আইন করে নতুন বাড়ি তোলা বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

নতুন পাড়াও তেমনি গড়ে উঠছে এখানে ওখানে। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট তো চেষ্টার কসুর করছে না কিছু।

প্রায় জোর করে মজুমদার থামিয়ে দিলেন দুজনকে। —কি যে বলেন আপনারা, বুঝিনা। আমি তো মনে করি কলকাতার নিন্দে কানে শোনাও পাপ। কলকাতায় থাকতে পেলে বর্তে যাই আমি, তা সে যদি সব চেয়ে এঁদো পাড়া হয় তাতেও গররাজি নই। এবারে অনেক দিন একটানা রয়েছি, নইলে এমনি তো বছরে বার দুয়েক আসা হয়ে উঠতো, থাকতুম দুবার মিলিয়ে দিন কুড়ি বড় জোর, কিন্তু যখনই এসে নেমেছি, মনে হয়েছে এতদিনে নিজের ঘরে ফিরলুম বুঝি। ট্রাম-বাস, প্রাসাদ-পথ, ভিড়-গোলমাল, ঘিঞ্জি-আবর্জনা, সব গুণ সব দোষ মিলিয়ে এ আমার একান্ত নিজের কলকাতা।...বাইরে যাননি তো, গেলে বুঝতেন! আলো, মশাই আলো; কলকাতা সারা ভারতের আলো! এমন শহর কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি! এর তুলনায় আর সব অন্ধকার ঘুরঘুট্টি!

সমীর বললে, রাখো তো তোমার কলকাতার রূপকথা! এস-আর-সি কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে বম্বেতে কিরকম গণ্ডগোল শুরু হয়েছে দেখেছো তো? কর্তারা বলছেন, বোম্বাই নাকি সেণ্টারের আণ্ডারে যাবে। আজ বোম্বাই গেলে কোন্‌দিন শুনবে কলকাতা-মাদ্রাজেরও ঐ এক গতি।

—কখনোই না! কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজ যাবে সেণ্টারের লেজুর হতে, এ কি আন্দামান-নিকোবর পেলে নাকি? এখানে থাকি আর না থাকি, সে দুর্দিনে জেনো হাজির হবো ঠিক! হাতে হাত মিলিয়ে লড়বো সবাই মিলে।

যখন কথা বলেন সুনন্দন মজুমদার, চোখ দুটোতে একটা সহজ হাসি উপচে পড়ে। মনে হয় কৌতুক করছেন বুঝি। কিন্তু চোখ যাই বলুক,

এমন একটা ভিজে স্পর্শ পেলুম ওঁর গলায়, বুকটা টন টন করে উঠলো।

বাইরে এলুম। তখন সাতটা বেজে ঠিক পঁয়তাল্লিশ। রাস্তা পার হয়ে পশ্চিমে এসে দাঁড়ালুম তিন সঙ্গি। ওদের দুজনের পোস্তা যাবার কথা। একটু আগে শুনেছি সমীরের মুখে। আমি যাবো ভিন্ন পথে, বাস ধরবো। সমীর ক' পা এগিয়ে গিয়েছে একখানা ট্যাক্সি ধরবার আশায়। সহসা একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটে গেল সেই মুহূর্তে, যার নির্বাক সাক্ষী একমাত্র আমি। দেখলুম, সুনন্দন মজুমদারের অমন হাসিখুশি মুখখানার অকস্মাৎ আশ্চর্য রূপান্তর ঘটে গেল। যেন পরম অভাবনীয় কিংবা অপার্থিব কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন ভদ্রলোক। নইলে অতখানি উদগ্র বিস্ময়ের দৃষ্টি কি স্বাভাবিক মানুষের চোখে সম্ভব হয়?

ওঁর দৃষ্টির পিছু নিয়ে নজর পড়লো একটু দূরে বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে। টু-বি'র স্টপেজে ভিড়ের মধ্যে মিশে দুটি মেয়ে বাসে উঠছে। আমি দেখলুম, দ্বিতীয়া কন্যাটি সবে হাতল ধরেছে। মুখখানা দেখা গেল না ঠিক মতো, পিছনের বেণীটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পিঠের দুপাশে দুটি দীর্ঘ গুচ্ছ হয়ে দুলছে, প্রান্তে দুটি লাল ফিতের বড় বড় ফুল। তারপরেই ভিড়ে আড়াল পড়ে গেল সব।

সমীর ইতিমধ্যে একখানা ট্যাক্সি দাঁড় করিয়েছে।

মজুমদার নিজেকে সামলে নিয়ে স্থির চোখে এক পলক তাকালেন আমার দিকে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সমীরকে বললেন, সমীর ভাই, এক্সট্রিমলি সরি। বলতে ভুলেছি, শ্যামবাজারে ভীষণ জরুরি একটা কাজ ছিল সন্ধ্যের দিকে, যেতে হবে এখুনি। ঠিক সাড়ে নটায় ফোন

করবো তোমায়, হরদয়ালের সঙ্গে কি এগ্রিমেণ্ট হলো জেনে নেবো। কিছু মনে কোরোনা ভাই, প্লিজ !…অনীশবাবু চলি তাহলে। আবার দেখা হবে।

আশ্চর্য লাগলো ! পুরো দুটি ঘণ্টা একসঙ্গে কাটিয়ে গাল-গল্প করে ভদ্রলোকের অন্তরের স্বচ্ছ যে রূপটি বারে বারে চোখে পড়ছিল, কে যেন কালি-ঝুলি মাখিয়ে দিলে এক পোঁচ।

সম্ভবত ঐ মেয়ে দুটির একজন, কিংবা হয়তো দুজনেই পূর্ব-পরিচিতা ওঁর, আত্মীয়তা থাকাও অসম্ভব নয়। কিন্তু অকারণে এ লুকোচুরি আচরণের প্রয়োজন ছিল না তো কিছু !

লক্ষ্য করলুম মজুমদার আগের সেই বাসটি মিস্ করলেন। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন পথের মাঝখানে। তারপর বোধ হয় পরবর্তী বাসটির আশায় স্টপেজের দিকে এগোলেন।

সমীর অবাক হয়ে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

দুই

সমীরের কথা

বছরের প্রথম সকালের ঘুমটি ভাঙলো সুখবর শুনে।

রেঙ্গুন থেকে ট্রাঙ্ক কল করেছিল মজুমদার। চুটিয়ে শিপ মেণ্ট করছে ওখান থেকে। দামোদর সর্দারের লোক অবধি পাল্লা দিয়ে পারছে না। হবে নাই বা কেন? অনেক দিন ছিল ওদিকে, বহু পার্টির সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ মেশামেশি, কাস্টম্‌সের কর্তাদের সঙ্গেও খাতির প্রচুর। জানি, ওস্তাদের খেলা শেষ রাত্রে, নইলে সিজনের শেষাশেষি নিজে ফিরে এসে ওকে ঠেলে পাঠাই? অথচ জ্যেঠামশাই কতই না বকাবকি করলেন এ নিয়ে!

অনীশকে সেই কথাই বলছিলুম। এসেছিল জ্যাঠাইমাকে দেখতে, যদি সম্ভব হয় জয়ন্তীকেও অমনি নিয়ে যেতে। জ্যাঠাইমা এখন ভালর দিকেই, সামলে নিয়েছেন এবারের ধাক্কাটা। জয়ন্তী কিন্তু গেলনা, বললে আরও একটা সপ্তাহ দেখে যাবে। অনীশকে একটু মনঃক্ষুণ্ণ দেখলুম, যদিও মুখভাবে তা প্রকাশ করতে রাজি নয়। তবে অন্য ফাঁকে বিরক্তিটা বেরিয়ে পড়লো ঠিকই। আমার কথা শুনে ভ্রূ কুঁচকে বললে, ভদ্রলোককে নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করছো না কি তোমরা?

—কি রকম?

—রকমের কম তো কিছু দেখলুম না। ওপরে জ্যেঠামশাই তো প্রশংসায় পাঁচ মুখ,—তোমাদের ফার্মে ভদ্রলোক ঢুকে ইস্তক না কি ধুলো মুঠো ধরছো সোনা মুঠো হচ্ছে। আজ দুবছর ধরে অর্থাৎ কিনা সেই

চোখ অপারেশনের পর থেকে উনি নিজে কিছুই দেখতে শুনতে পারছিলেন না। তুমিও ছেলেমানুষ, সব দিক সামলাতে হিম-সিম খেয়ে যাচ্ছিলে ইত্যাদি ইত্যাদি। অতঃপর জ্যাঠাইমার ঘরে গিয়ে যা শুনলুম তা তো আরও এক কাঠি বাড়া! ওর মুখে মা ডাক শুনে তিনি সম্পূর্ণ বিগলিত, সে ডাকে যাতে পূর্ণচ্ছেদ না পড়ে, বাসনা, কন্যা আরতিকে ওর হাতেই সমর্পণ করেন। এ যে দেখছি যাদু করলে তোমাদের সবাইকে!

জ্যাঠাইমার গোপন ইচ্ছেটা কদিন ধরেই অস্পষ্ট গুঞ্জিত হচ্ছে বাড়ির ভেতরে, আভাস পেয়েছি তার। এ প্রস্তাবে জয়ন্তীর সায় নেই এমনটাও মনে হয়েছে। বুঝলুম, সেই লুকোনো আপত্তির ধ্বনিই প্রতিধ্বনি তুলছে অনীশের কণ্ঠে।

বললুম, বিয়ের কথা উঠেছে এতটা শুনিনি আমি। তবে মনে মনে এমন একটি আশা হয়তো লালন করছেন জ্যাঠাইমা, এ কথাটা সত্যি হতেও পারে। জ্যাঠামশায়ের শরীরের ঐ অবস্থা, নিজেরও বয়স হচ্ছে, বুড়ো বয়সের মেয়ে, ভাবনা তো আছেই। তাছাড়া শ্যামা মেয়ের সুপাত্র জোটা কত মুস্কিল তাও অজানা নয় তোমার। টাকার লোভে আসছে অবশ্য অনেকেই কিন্তু তাদের তুলনায় সুনন্দন মজুমদার সহস্রগুণে শ্রেয়।

অনীশ বললে, কি জানি। সেদিন নিজের কানেই শুনলুম ভদ্রলোকের বয়স ছত্রিশ পেরিয়ে এলো প্রায়। আর কবছর পরেই প্রৌঢ়ত্বে পা দেবে যে লোক তার হাতে রতিকে সঁপে দেবার কথা কল্পনাতেও আসেনা আমার।

—বুঝলুম তোমার কথা। কিন্তু রতিও তো তেইশ পেরিয়ে চব্বিশে পড়লো। জ্যাঠাইমা বলতেন, জয়ন্তী আর রতির বিয়ে আমি একসঙ্গে দেবো। তা সেই জয়ন্তীরও বিয়ে হয়ে দুবছর পুরতে চললো। আর

কমাস পরেই তোমাদের বিয়ের তৃতীয় বার্ষিকীর নেমন্তন্ন পাবো।... তাছাড়া তোমার নিজের কথাই ধরো না? তুমি এখন একত্রিশ যাচ্ছো। বিয়ে করেছো মোটে এই আঠার মাস। আমি তোমার চেয়ে বছর-খানেকের ছোট হবো, বিয়ের কথা ভাবছিই না মোটে। জ্যাঠাইমার সামনে থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই! আসল কথা হলো কিছুটা গুছিয়ে না বসে কোন ছেলেই আর জড়িয়ে ফেলতে চাইছে না নিজেকে।

বাধা দিয়ে অনীশ বললে. আমার কথা যদি ধরো ভাই, আমি এখন রীতিমতো অনুতাপ করছি কটা বছর মিথ্যে নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে। আমার মতে বিয়ের বয়স হওয়া উচিত ঠিক পঁচিশ ছেলেদের, আর মেয়েদের উনিশ।

—এই সেদিনও তুমি ঠিক উল্টো বলতে কিন্তু।

—বললুম তো ভুল স্বীকার করছি। তখন তো তোমার ভগ্নিকে দেখিনি!

—মিথ্যুক! দেখোনি মানে? বিয়ের পুরো একটি বছর আগে থেকে "শুধু যাওয়া আসা শুধু স্রোতে ভাসা" সে কি অমনি?

—সে তো আসতুম তোমাদের বাড়ির বইগুলোর লোভে। কেউ পড়ো আর না পড়ো তোমাদের বাড়ির লাইব্রেরীটি যে প্রথম শ্রেণীর তা মানতেই হবে। এদিক থেকে সত্যি গুণী লোক ছিলেন শ্বশুর মশাই।

—বটে? ঐ জন্যেই আসতে শুধু? তোমার ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী গেল, ন্যাশনাল লাইব্রেরী গেল, যত কেতাব বাগবাজারের এই সতেরো নম্বর বাড়ির ঘরোয়া কলেকশনে? হিসেব করে কথা বলো প্রফেসর, ভুলোনা, তোমার অনেক অতীতের সাক্ষী আমি! কৃপা করে

টেনে না তুললে তো স্রোতে ভেসেই কাটাতে, মুখে কি আর রা ফুটতো কোনদিন ?

হাসি মুখে অনীশ বললে, কৃপা যে কে কাকে করেছে সেটা আজও সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণ হয়নি জেনো। আমার নিজের ধারণা ভ্রাতৃ-কন্যাদায়গ্রস্ত সুধীর চৌধুরী মশাইকে উদ্ধার করে কুলীন ব্রাহ্মণোচিত কর্তব্যটুকু পালন করেছি মাত্র।

—বেশ, জয়ন্তীকে ডাকি তবে ? সন্দেহের নিরসন হয়ে যাক।

—প্লিজ, ঐটি করোনা ভাই ! এমনিতেই এখনো সাত দিন উনি থাকবেন এখানে। এরপর আবার মেয়াদ বাড়লে, শেষে একটা শক্ত অসুখ বাধিয়ে ফেলবো। দেখোনা রিস্টওয়াচটা এই কদিনেই কি রকম ঢিলে হয়ে গিয়েছে কব্জিতে।

—স্ত্রৈণ !

—মানছি। কিন্তু তোমার তো তাতে খুশিই হওয়া উচিত ভাই !

বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেললুম। বললুম, সুনন্দন মজুমদার সম্বন্ধেও তোমাকে একদিন স্বীকার করতে হবে গোড়ায় ওকে চিনতে পারোনি ঠিক।

—কিন্তু, তোমার বিজনেসের পার্টনার, তাকে আমি ভুল বুঝি কি ঠিক বুঝি তাতে সত্যিই কিছু আসে যায় কি ? কেন যে এর ওপর এমন গুরুত্ব দিচ্ছ তুমি বুঝতে পারছিনা।

বললুম, এখন হয়তো কিছুই যায় আসে না, তবে এ পরিবারে ওকে নিকটতর করার প্রস্তাবটি অঙ্কুর থেকে পল্লবিত হয় যদি, তোমার এবং জয়ন্তীর মতামতের একটা মূল্য ধরা হবে বৈকি।

অনীশ ঘাড় নাড়লে, না ভাই, ও বিষয়ে আমি একমত নই, তোমাকে আগেই বলেছি।

বললুম, বয়সের কথা উল্লেখ করলে একটু আগে, অমনি স্বাস্থ্যের কথাটাও ভাবো। আমাদের বাঙালী ছেলেদের মধ্যে অতখানি সুগঠিত শরীর কটা পাবে তুমি ?

তাচ্ছিল্যের স্বরে জবাব দিলে ও। স্বাস্থ্যটাই যদি একমাত্র কোয়ালিফিকেশন ধরো, বিষ্টু ঘোষের আখড়া থেকে একজন হাতী-তোলা জোয়ান ধরে আনলেই পারো। তারা অন্তত কেউ অজ্ঞাত কুলশীল নয় !

—অর্থাৎ ?

জয়ন্তী ইতিমধ্যে ঘরে এসে ঢুকেছে। পূবের জানলাটা খুলতে খুলতে বললে, না তো কি ?

বুঝলুম জোট বেঁধেছে ওরা। বিরক্ত হয়ে জবাব দিলুম, জানিস কত বড় পণ্ডিত বংশের ছেলে ?

বাধা দিয়ে ও বললে, সে কথাই নয়। বংশ মর্যাদার কথা মোটেই বলিনি আমি। আমি শুধু বলতে চাই, লোকটা একটা ভবঘুরে নম্বর ওয়ান, আজ এদেশে কাল ওদেশে ভেসে বেড়াচ্ছে। কলকাতায় রয়েছে এই একবছর, অথচ যখনই শুনি কোন্ হোটেলে আস্তানা।

বললুম, হ্যাঁ তাতে হয়েছে কি ? হ্যারিসন রোডের ঐ হোটেলটি খুব প্রিয় ওর, এলে ওখানেই ওঠে বরাবর।

—কিন্তু কেন ? এত বড় এই শহরে আত্মীয়স্বজন এমন কেউ নেই যেখানে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই মেলে ?

—কথা বলিস তার মানে হয়না। প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব পছন্দ কতগুলো থাকে। তাছাড়া বিদেশে বাইরে দীর্ঘদিন যাদের কাটাতে হয়েছে, একলা থাকাটা তাদের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়।…অন্য কথাও আছে এর মধ্যে। গোড়ার দিকে অনেক লড়াই করে দাঁড়িয়েছে বেচারা। সে সময়ে শুনেছি স্বজন বন্ধুরা কেউই মুখের দিকে

তাকায়নি। আজ যদি ও তাদের সংস্পর্শে আসতে নারাজ হয়ে থাকে, দোষ দেওয়া চলে কি ?

অনীশ এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। বললে, আমারও আর একটা কথা বলার আছে, শোনো তো বলি।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালুম।

—সেদিন সুনন্দনবাবু স্বমুখেই ব্যক্ত করলেন, কাজ করেছেন বহু ফার্মে কিন্তু স্থায়ী হয়ে বসেননি কোথাও। শুনছি তো কাজের লোক খুব। তবু এমনটা হবার কারণ কি হতে পারে ভেবে দেখেছো তুমি ? তোমাদের ওখানেও যে কত দিন স্থির মস্তিষ্কে টিকে থাকবেন উনি, সন্দেহ আছে আমার·।

ঠিক বোধগম্য হলোনা কি বলতে চাইছে ও।

—আরও একটা বিষয় বলি। তোমার বন্ধুর চোখ দুটি যেমন স্বচ্ছ, মনটিও তেমন কিনা সেটাও বিবেচনা করে দেখা উচিত। সেদিন রাস্তার মাঝখানে মিথ্যে অজুহাত সৃষ্টি করে হঠাৎ কি ভাবে চলে গেলেন তা তো দেখলেই ! ঘটনাটা রীতিমতো বিসদৃশ লেগেছে আমার।

হেসে উঠতে হলো। বললুম, তোমার বিরূপতার সেইটেই তবে আসল কারণ বলো ? তুচ্ছ একটা ঘটনাকে ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করে তোলা তোমাদের ঐতিহাসিকদের একটা বিশ্রী স্বভাব। সাধে আর ছেলেরা 'এল মুখুজ্জে'র নোট সার করেছে ?

অনীশ মন্তব্য করলে, তুচ্ছ বলেই তো বেশি খারাপ লেগেছে আমার। তুমি সে রাত্রে দেখতে পাওনি কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছিলুম টু-বি বাসে দুটি তরুণীকে দেখে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন উনি।

শুনে সংশয় সৃষ্টি হয়ে গেল মনে। এটা ঠিক, যে তার পরের দিন থেকেই যথেষ্ট অসঙ্গতি চোখে পড়েছে মজুমদারের আচরণে।

কাজ কর্ম করে গেছে যথারীতি, অথচ কেমন যেন দায়-সারা গোছের। অবশ্য তার পরে ছিল তো মোটে দু দিন, কিন্তু যাই হোক, যেন অন্য মানুষ! সব সময়েই দেখেছি অন্যমনস্ক, স্তিমিত চোখ দেখে মনে হয়েছে কোন্ সুখ-স্মৃতির জাবর কাটছে বুঝি! রেঙুন যাবার সব ঠিক, পাশপোর্ট ভিসা সব তৈরি, শেষ মুহূর্তে বেঁকে দাঁড়িয়ে বললে, তুমিই যাও রেঙুনে ফিরে, আমি এদিকটা ম্যানেজ করছি। অথচ ও ভাল করেই জানে আমি রেঙুনে এবার সুবিধে করতে পারলুম না বলেই তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ওকে পাঠাবার জোগাড় করছি। তাছাড়া ওখানকার অভিজ্ঞতার জন্যেই তো ওকে ঢোকানো আমাদের ফার্মে।

সবচেয়ে তাজ্জব কাণ্ড ঘটলো শুক্রবার। অনীশের সঙ্গে দেখা হবার ঠিক পরের দিনই। চারটের মধ্যে চলে গেল পোস্তা থেকে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। মুটেদের একজনকে ডেকে দুটো সারিডন আনিয়ে দিলুম। নির্বিবাদে পকেটে পুরলে। বললে, আজ চলি। ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরছি, রূপবাণীর কাছে এসে দেখি একটা গলির মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে মজুমদার। ভাবগতিক দেখে মনে হয় কারও অপেক্ষা করছে যেন। এতই তন্ময়, দুবার হর্ণ দিলুম, মুখখানা ঘোরালে না পর্যন্ত!

—চুপ করে গেলে যে, কি ভাবছো অত? অনীশ জিজ্ঞাসা করলে।

বললুম, কিছু না। তবে জয়ন্তীর সঙ্গে তুমিও জোট বেঁধে ক্ষেপে গেলে কেন সুনন্দনের ওপর সেইটেই বুঝছিনা। সত্যিই তো বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে যায়নি কিছু। জ্যাঠাইমা শুধু মধ্যে একদিন বলেছিলেন ওর সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত খোঁজ খবর নিতে। আমি জবাব দিয়েছি রেঙুন সিজনের এই দুটো মাস না কাটলে কোন দিকে আর

চোখ-কান দেবার ফুরসৎ নেই। যাক ওকথা, পরে প্রয়োজন হলে ভাবনা চিন্তা করে ঠিক করা যাবে'খন।

জয়ন্তী চলে গেল ভেতরে। ফিরলো মিনিট দুই পরেই চাকরটাকে সঙ্গে করে। দেখি একরাশ খাবার।

বললুম, দুটো থালা যে? অনীশকে দে শুধু, আমি এই সকালে অত খাবার খাই কখনো?

—বা! ঘুম থেকে উঠেই যে বললে বেরিয়ে যাবে সাড়ে আটটার মধ্যে, ফিরতে দুপুরও হতে পারে আবার চারটেও বাজতে পারে?

—সে বললুম এই জন্যে দুপুরে মিথ্যে কেন খাবার নিয়ে অপেক্ষা করবি তোরা! আমি বাইরে খেয়ে নেবো।

অনীশ বাধা দিলে, হাতের কাছে যা পেয়েছ ছাড়বে তা বলে? এসো শুরু করা যাক।

—না ভাই পারবো না, শুধু তোমার কথা রেখে সামান্য একটুখানি তুলে নিচ্ছি। আমাদের কাজ তো জানোনা, নানান ঝামেলা। এক পেট খেয়ে শুধু হাঁস-ফাঁস করে মরবো। এ তো তোমাদের কলেজের মাস্টারি নয়, পাখার তলায় বসে নিজের পুরোনো নোটগুলো নতুন করে ঢেলে সেজে ছাত্র ভোলানো! ঐ তো কাজ, তার ওপরে আছে বারো মাসে তেরো পার্বণের ছুটি।

—হিংসে হচ্ছে বুঝি?

ওর মন্তব্য শুনে জয়ন্তী হেসেই অস্থির।

মেয়েটা হাসে সত্যি চমৎকার, রোদের কিরণে উপচে পড়া পাহাড়ী ঝর্ণার মতো! এমনিতেই হাসিখুশি বরাবর। ইদানিং যেন বেড়েছে আরও। সুখী হয়েছে জয়ন্তী, বেশ আছে দুটিতে! অথচ গোড়ার দিকে কতই না মিথ্যে ভেবেছি। অনীশের তো মাইনে মোটে

ছ'শোটি টাকা! টিউশনি করে অবশ্য আরও কিছু হয়, আর বাড়িটাও পৈত্রিক, তবু এ বাজারে ঐ আয়ে সংসার চালিয়ে এত হাসিখুশি থাকে কি করে ওরা? কে জানে, বোধ হয় বিয়ের আগে থেকে মন দেয়া-নেয়া হলে অনেকগুলো বোঝাপড়াও সারা হয়েই থাকে!

একটা কথা মনে পড়লো। বললুম, সেই কে একটি মেয়ের কাজের জন্যে বলেছিলে না তুমি? আছে একটা কাজ, আমাদের ওখানেই, মানে আমাদের ডেলহৌসি স্কোয়ারের অফিসে। টাইপিস্টের কাজ, টেলিফোন রিসিভও করতে হবে। যদি করতে চায় কবে থেকে জয়েন করতে পারবে জেনে খবর দিও। মাইনে একশো দশ।

—তুমি যেদিন বলবে সেইদিন থেকেই কাজ আরম্ভ করে দেবে। খুব উপকার করলে কিন্তু, মেয়েটিকে কথা দিয়ে মুস্কিলে পড়েছিলুম খুব।

—কার কথা বলছো গো? জয়ন্তী শুধোলে।

—সেই যে বাঁশরীর কথা বলেছিলুম না তোমায়? বাঁশরী রায়?

—ও, তোমার সেই হঠাৎ-পাওয়া বোন!

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলুম, হঠাৎ পাওয়া বোন মানে?

—জিজ্ঞেস করোনা ওকে! শিয়ালদা স্টেশনে ভাব হয়েছিল। সে আজ কতদিনের কথা। সেই থেকে দাদা বলতে তিনি অজ্ঞান। উনিও কেমনতরো হয়ে পড়েন বাঁশরীর নাম করতে। কে জানে এমন পাতানো বোন আরও ক'টি আছে তোমার বন্ধুর!

সন্দেহ হলো। রাগ করে কথা বলছে না কি জয়ন্তী? ফিরে দেখি, না, চোখ দুটো ওর প্রচ্ছন্ন কৌতুকে নীরবে হাসছে। সহাস্যে বললুম, সন্দেহজনক মনে হচ্ছে যেন! ব্যাপারটা তো শুনতে হয় তা হলে।

—দূর! শোনো কেন ও মেয়ের কথা। ঝগড়া বাধাবার জন্তে পা বাড়িয়েই আছে সব সময়। অনীশ মন্তব্য করলে।

—দাদাকে বলো না কেন তবে?

—বলবোই তো! তবে ব্যাপার-স্যাপার কিছুই নেই এর মধ্যে। সেটা আগেই জেনে রাখা ভালো, পরে আর আশাভঙ্গ হবে না তাহলে!

সে আজ বছর সাত আট হলো প্রায়। এম, এ পরীক্ষা শেষ হয়েছে সবে। গিয়েছিলুম কৃষ্ণনগরে এক আত্মীয়ের বাড়ি। শিয়ালদা স্টেশনের সে সময়কার অবস্থাটা মনে আছে নিশ্চয়? একটার পর একটা ট্রেন আসছে সীমান্ত পেরিয়ে উদ্বাস্তু বোঝাই হয়ে। চতুর্দিকে সংসার সাজিয়ে বসেছে সকলে। প্ল্যাটফর্মে পা ফেলার জায়গাটুকু রাখেনি কোথাও। চেহারা দেখে মনে হয় সত্ত শ্মশান থেকে ফিরেছে বুঝি। কি দিনগুলোই গিয়েছে!

বললুম, আবার তো ইনফ্লাক্স শুরু হয়েছে, খান্নার রিপোর্টটা দেখেছ নিশ্চয়?

—তাহলেও তফাৎ রয়েছে বৈকি! এখন যারা দেশ ছাড়ছে তারা আসছে অর্থনীতিক দুরবস্থার চাপে পড়ে, পেট চালানোর সমস্যাটাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে যাদের। প্রাণের ভয়, মানের ভয় আগের মতো এগুলো তো অত প্রবল নয় এখন।...একটা কথা আমরা পরিষ্কার-ভাবেই বুঝে নিয়েছি, বাংলার পূর্বেই কি আর পশ্চিমেই কি দাঙ্গা হানাহানির পুনরাবৃত্তি কোনদিনই ঘটবে না আর।

জয়ন্তী তাড়া দিলে, বক্তৃতা থামিয়ে যা বলছিলে শেষ করো তো আগে!

—এই যে করি। গল্প-টল্প যদিও এর মধ্যে কিছুই নেই। কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলুম, শুনলে তো? ফিরছি বিকেলে। শিয়ালদা পৌঁছে দেখি তার একটু আগেই সীমান্ত থেকে স্পেশাল ট্রেন এসেছে একখানা। অবর্ণনীয় দৃশ্য! কোন মতে পথ করে বাইরে আসছি, চোখে পড়লো বছর দশ এগারোর একটি মেয়ে একে ডিঙিয়ে ওকে লাফিয়ে পড়ি কি মরি হয়ে দৌড়ে আসছে। ব্যাপারটা ঠিক বোঝার আগেই সামনে একজনের গায়ে ধাক্কা লেগে ঠিক্‌রে এসে আমারই ওপর পড়লো মেয়েটি। তারপরে দু-হাত দিয়ে প্রাণপণে জড়িয়ে ধরলে আমায়।

পিছু পিছু ছুটে আসছিল জন দুই ভলাণ্টিয়ার। ঘিরে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে।

তাদের মুখে শুনলুম সব। দু-দিন আগে এসেছে ওরা। মা বাপ আর এই মেয়ে। সকালে কলেরার লক্ষণ দেখা দেয় প্রথমে বাপের, এক ঘণ্টা পরে মায়ের। দুজনকেই হাসপাতালে পাঠান হয়েছে। মেয়েটাকে আটকে রেখেছেন ওঁরা। সমানে কেঁদেছে সারাটা দিন, এখন গাড়ি এসেছে ক্যাম্পে নিয়ে যাবে, কোন ফাঁকে দিয়েছে দৌড়।

যাকে নিয়ে এত কথা, সে এদিকে সেই যে কোঁচার খুঁটটি ধরেছে আমার, ছাড়বার নামটি নেই। ভলাণ্টিয়ারদের ইচ্ছে ওকে টেনে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তোলে। ওর ইচ্ছে ঠিক তার বিপরীত।

জোর করে হাতখানা ছাড়িয়ে নিতে পারতুম। কেন জানি মায়া হলো, ভলাণ্টিয়ারদের সঙ্গে চল্‌লুম ওদের কর্তার কাছে।

একখানা ছোট টেবিল, খানতিনেক চেয়ার নিয়ে অফিস বসানো হয়েছে। যে ভদ্রলোক মাঝের চেয়ারটিতে বসে, ভাগ্যক্রমে তিনি

দেখলুম পূর্বপরিচিত। ঠিকানা ইত্যাদি জমা রেখে যতদিন ওর বাবা-মা সেরে না ওঠেন আমার বাড়ি নিয়ে গিয়ে রাখার অনুমতি আদায় করে তবে ছাড়লুম।

বাড়ি ফিরে মার হাতে সমর্পণ করলুম মেয়েটিকে। সব শুনে মা-ও অখুশি হলেন না।

মেয়েটি কিন্তু এদিকে লাজুক খুব! দিন পনেরো ছিল আমাদের বাড়ি, টফি দিয়ে খেলনা দিয়ে কিছুতেই ভাব জমাতে পারলুম না। নামটি শুধু বললে, কুমারী বাঁশরী রায়, বাবার নাম শ্রীসদাপ্রসন্ন রায়। ঐ একরত্তি মেয়ে, মার মুখে শুনলুম পড়ছে ক্লাশ সিক্সে। ওর বাবাই না কি হেডমাস্টার—গাঁয়ের স্কুলে।

জয়ন্তী টিপ্পনি কাটলে, ক্লাশ সিক্সের মেয়েকে গিয়েছিলে খেলনা দিয়ে ভোলাতে, বুদ্ধির ঐ বহর দেখেই ভাব করেনি তোমার সঙ্গে।

অনীশ বললে, বাঃ, টফিও দিয়েছিলুম যে? ক্লাশ সিক্সের খুকি কেন, শুনি তো সিক্সথ ইয়ারের মহিলারাও না কি ও বস্তু পেলে আর কিছু চান না!···যাক সে কথা, আমার একটা কাজ বাড়লো এদিকে। রোজ বিকেলে একবার করে যাই ক্যাম্পবেলে। গিয়ে খবর জেনে আসি কেমন আছেন মাস্টার মশাই আর তাঁর স্ত্রী। অথচ মজা এই চিনি না কেউ কাউকে।

থামিয়ে দিয়ে বললুম, বাচ্চা ছিল তাই বাপের স্কুল মাস্টারির কথাটা কবুল করে ফেলেছিল। এখন প্রশ্ন করলে শুনতে দেশে ওদের জমিদারী ছিল একটি মস্ত আকারের!

বিস্মিত গলায় অনীশ বললে, মানে?

বললুম, সেই রকমই যে শুনি। যেখানে যত রেফিউজি, সকলের মুখেই শোনো, ঐ এক কথা। এখানে এসে এই দুর্দশা ভোগ করছে।

দেশে অথচ জমিদারী ছিল সকলের। সবাই যদি জমিদার, প্রজাটা ছিল কে সেইটেই শুধু বুঝি না।

অনীশ বাধা দিলে। বললে, এ তোমার ভুল ধারণা। জমিদারী বলতে এখানে হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়ার কথা হচ্ছে না, তবে পূব বাংলায় প্রায় ক্ষেত্রেই জমির মালিকানা ছিল হিন্দুদেরই হাতে, এটা তো মানো ?

জয়ন্তী তাড়া দিলে, গল্পটা শেষ হয়নি কিন্তু এখনো।

—হয়ে এলো প্রায়, অনীশ জবাব দিলে।···প্রথম দিনকতক খুবই সিরিয়স অবস্থা চললো। আমি যদিও চেপে যেতুম সে কথা। বলতুম, খবর এনেছি, তোমার বাবা মা তুজনেই ভাল আছেন বাঁশরী, সেরেও উঠছেন খুব তাড়াতাড়ি। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতো বেচারি। চোখ তুটো ছলছলে হয়ে উঠতো। তারপরে ওঁরা ছাড়া পেলেন হাসপাতাল থেকে এবং একদিন সদাপ্রসন্ন বাবু এসে যথোপযুক্ত কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি জানিয়ে, নিয়ে গেলেন মেয়েকে। শুনলুম দূর-সম্পর্কের এক ভাই থাকেন টালিগঞ্জে, আশ্রয় মিলেছে সেখানে।

চলে গেল বাঁশরী। বাবা একদিন বললেন, মেয়েটা ভারী মায়াবী ছিল রে, চলে গিয়ে বাড়িটা খালি লাগছে, মন কেমন করছে।

আর কোন খবর রাখতে পারিনি ওদের। বাবা বাড়ি কিনলেন দমদমে, উঠে গেলুম সেখানে। কোথায় দমদম আর কতদূরে টালিগঞ্জ, বুঝতেই পারো।

বললুম, অতঃপর ?

অনেক কাল পরে হঠাৎ সেদিন দেখা। কলেজ থেকে ফিরবো, দাঁড়িয়ে আছি ট্রামের জন্তে। একটি তরুণী পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলে, দাদা চিনতে পারেন ? দশ এগারো বছরের বাচ্ছা মেয়েটা

এখন সতেরো আঠারোর তরুণী। চেনা কি সহজ? ত্রুটি স্বীকার করলুম।

বললে, ও সেই বাঁশরী। দর্জিপাড়ার কাছে কোন্ গলিতে রয়েছে ওরা এক তলার দুখানা ঘর ভাড়া করে। ইতিমধ্যে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে নিয়েছে, ইণ্টারমিডিয়েটের বইগুলো নাড়া-চাড়া করছে বাড়িতে। শুনলুম ভাল গাইতেও শিখেছে, মাঝে-মধ্যে এক আধটা প্রোগ্রামও নাকি পায় রেডিওতে। মা মারা গিয়েছেন গত বছর। বাবা ভাল কাজ পেয়েছিলেন। দেখতে দেখতে কি হলো, কানে হঠাৎ কম শুনতে শুরু করলেন। মাস্টার মশাই কালা হলে ক্লাশের অবস্থা কি হয় বুঝতেই পারো, সুতরাং কাজটি গেল। গত বছর থেকে খড়দার দিকে কোন্ দেশলাই ফ্যাক্টরিতে চাকরি করছিলেন, তাও আজ দুমাস বেকার, স্ট্রাইক চলছে সেখানে। বাঁশরী কাজ করছে টেলিফোনে। টেম্পোরারি এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট, সামনের মাস থেকে যাবে। অথচ ওর আয়েতেই সংসারটা চলছে কোন রকমে।···মোট কথা যাদের ভেবেছিলাম মহানগরীর চক্রে পাক খেতে খেতে কোথায় না জানি গড়িয়ে গিয়েছে, দেখি রীতিমতো দাঁড়িয়ে আছে তারা। শুধু দাঁড়িয়েই নেই, এগোচ্ছে!

উচ্ছ্বাসে বাধা দিতে হলো। বললুম, ক্ষেপেছো তুমি, গড়িয়ে যাবার পাত্র ওরা? উল্টে আমাদেরই গড়িয়ে গড়িয়ে কতদূরে ঠেলে পাঠাবে কে জানে! বড় কাজ-কারবার প্রায় সবই তো ভিন্-প্রদেশীর হাতে, টুক্‌রো টাক্‌রা যা কিছু ছিল, একটার পর একটা দখল করে নিচ্ছে ওরা।

অনীশের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য হলো, এটাও নাকি আমার আর একটা ভুল ধারণা! ওদের কাছে আমরা এখনো শিখতে পারি অনেক কিছুই!

ফুটবলের মাঠে যতই কেন কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করি, বৃহত্তর ক্ষেত্রে ওরা আমরা মিললেই তবে পরিচয় গোটা একখানা, নইলে নাকি আধখানা! এক এক সময় এমন বাড়াবাড়ি করে অনীশ, অসহ্য লাগে! উঠে পড়ে বললুম, ধীরে-সুস্থে তুমি শেখো ভাই, অনেক কাজ বাকি, আমি উঠলুম।

বাস্তবিক আটটা বাজে, আর দেরি করলে মুস্কিলে পড়তে হবে আমাকে।

তিন

বাঁশরীর কথা

অনীশদা যদি আমার নিজের দাদা হতেন, বেশ হতো! সাত বছর আগে শিয়ালদা স্টেশনে ছুটে পালাতে গিয়ে যেদিন ওঁর গায়ের ওপর ধাক্কা খেয়ে পড়েছিলুম আর অভয় আশ্বাস দিয়ে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন উনি নিজেদের বাড়িতে, সেদিন যে ডাকটি শুধু মনে মনেই গুঞ্জিত হয়েছিল, এবার দেখা হতে তা স্পষ্ট উচ্চারণে বললুম। মহানগরের নাগরিক হয়ে রয়েছি এতদিন, সেই লাজুক মুখচোরা মেয়েটি নেইতো আর। এই নির্লজ্জতম শহরে লজ্জা নিয়ে বেঁচে থাকার সাধ্যই আছে নাকি কারও?

উনি উঠতে যাচ্ছিলেন ট্রামে। আমি ফিরছিলুম সাধনা ঔষধালয় থেকে বাবার জন্যে একটা ওষুধ নিয়ে। অচেনা মেয়ের গলায় দাদা ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালেন আনীশদা, ভ্রূ কুঁচকে ফিরে তাকালেন আমার দিকে।

—চিনতে পারছেন না দাদা? আমি বাঁশরী!

আরও কিছু বলা উচিত ছিল নিশ্চয়। এতকাল পরে শুধু নাম শুনেই চিনবেন এমন স্পর্ধা না করাই ভাল ছিল। কিন্তু এতদিনের ব্যবধানে হঠাৎ ওঁকে দেখে চকিত আনন্দের মস্ত একটা ঢেউ এমন করে ধাক্কা দিয়ে গেল বুকের মধ্যে, গুলিয়ে গেল সব!

মোটা লাইব্রেরী ফ্রেমের চশমার ভেতর দিয়ে বিস্ময়ের দৃষ্টি ফেললেন উনি আমার ওপর। আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার।

আশ্চর্য, চিনতেও পারলেন! বললেন, তুমি? বাঁশরী? কত বড় হয়ে গিয়েছ, কত বদলে গিয়েছ। চিনতেই পারিনি প্রথমে!

চাউনিতে পরিচয়ের দীপ্তি ফুটতে দেখে আশ্বস্ত হলুম। বললুম, হ্যাঁ কতকাল পরে দেখা, চিনবেন কি করে?…খবর সব ভাল তো দাদা? মা বাবা ভাল আছেন সব।

বললেন, বাবা নেই আজ চার বছর হতে চললো। মা একরকম ভালই। তারপর তোমাদের খবর সব বলো। এখন আছ কোথায় তোমরা?

রাষ্ট্রনীতির দাবা খেলায় মাত হওয়া বোড়ে আমরা, আমাদের আবার খবর! দুএক কথায় সংক্ষেপে জানালুম। মা মারা গিয়েছেন শুনে চুপ করে রইলেন। আমি স্কুল ফাইন্যালে পাশ করেছি, রেডিওতে গান গেয়েছি, শুনে আনন্দ করলেন।

সব শেষে বাবার হাঁফানির কথা উঠলো। বলবো না বলবো না করেও একটা চাকরির জন্যেও অনুরোধ করে ফেললুম শেষ পর্যন্ত। টেলিফোনের কাজটা তো সামনের মাস থেকে চলে যাবে। তা'ছাড়া প্রায়ই ওখানে রাত্রে ডিউটি। বাবার শরীরও রাত্রের দিকেই খারাপ করে রোজ। প্রথম দিকে অল্পক্ষণ যেটুকু ঘুমিয়ে নেন, বাকি সমস্ত রাত শ্বাস কষ্টে দুচোখের পাতা এক করতে পারেন না কিছুতেই। দুপুরের চাকরি হলে সেবা-যত্ন একটু করতে পারি ওঁর।

চাকরির কথা তুলতেই অশ্বস্তি বোধ করলেন অনীশদা। বুঝতে পারলুম। বললেন, তবেই তো মুস্কিলে ফেললে বাঁশরী। সকলের মুখেই এক কথা আজ, চাকরি চাই, অথচ চাকরি দেবার মালিক যারা তাদের ইচ্ছে ছাঁটাই। কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটে এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুরোতে নাম লিখিয়ে রাখোনি তুমি?

জবাব দিলুম, লেখানো আছে বটে, তবে অনেক শেষের দিকে নাম। শীগগির ডাক পড়বে এমন আশা কম।

কথায় কথায় এগিয়ে চলেছি। বললেন, চা খাবে না কি ?

বললুম, হ্যাঁ খাবো, কিন্তু দোকানে নয়। আর অল্প গিয়েই আমাদের বাসা, চলুন বাবার সঙ্গে দেখা করে যাবেন।

উনি ঘড়ি দেখে বললেন, আজ আর হবে না ; তোমাদের ঠিকানাটা দাও বরং, পরে একদিন যেতে পারি।

—বেশ, এই রোববার আসুন তবে ! দেখবেন ভুলে যাবেন না যেন ! ...আর, আমার কাজের কথাটাও দয়া করে মনে রাখবেন। টাইপিস্টের কাজ তো মেয়েরা সহজেই পেয়ে যায় শুনেছি, টাইপ করাও শিখছি আমি ; আর ছুটো লেশ্‌ন বাকী মোটে।

—আশা দিতে পারছি না ঠিক। নিরীহ মাস্টার আমি, কর্তা-ব্যক্তি মামা-মেশো কেউ নেই তো তেমন ! তবে চেষ্টা করবো, নিশ্চয় জেনো।

তারপরে একটা, ছুটো, তিনটে রোববার আশায় আশায় গেল, কবে উনি আসেন। এলেন ঠিক দেড় মাস পরে। একেবারে এই কাজের খবরটি নিয়ে।

আমাদের ইণ্ডো-বার্মা ট্রেডিংএর অফিস যে বাড়িতে তার ঠিক মুখোমুখি স্টক এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং।

নেতাজি সুভাষ রোডের মুখ থেকেই গুঞ্জন শোনা যাবে। আর একটু ভেতরে ঢুকলে মনে হবে রীতিমতো হট্টগোল চলছে বুঝি কাছা-কাছি কোথাও। রবিবারে যেমন লাগে হাতীবাগানের হাটে। কিংবা

তার মতোও নয় ঠিক। এমনি করে রাস্তা আটকে ভিড় করেনা কেউ সেখানে, চিৎকারও করে না এমন সমবেত তারস্বরে। অন্তত এমন সুবেশ ভদ্রচেহারার দল যাদের পরণে দামী স্যুট, নয়তো গিলে-করা পাঞ্জাবি, কাঁচি ধুতি! তবে ভিন-প্রদেশীই বেশি, মাথায় খাদি টুপি, গায়ে ঝকঝকে মাড়োয়ারি লং-কোট। এই নাকি কলকাতার শেয়ার বাজার! ফাটকা ওয়ালাদের শ্রীক্ষেত্র! বাক্য মানে যে ব্রহ্ম তার বিশ-শতকের প্রমাণ ক্ষেত্রও বটে। মুখে মুখেই লাখো টাকার খেলা চলছে এখানে সকাল থেকে সন্ধ্যে, হাতে ছোঁয়না কেউ।

ঐ হট্টগোল পেরিয়ে তিন তলার সিঁড়ি ভেঙে আমাদের ফার্ম। প্রথম দিন তো একেবারে নিরাশ হয়ে পড়েছিলুম। মোটে দুখানা ঘর নিয়ে অফিসের সজ্জা। তাও নয় ঠিক ; একখানাই লম্বা ঘর, মাঝখানে প্লাই-উডের পার্টিশন দিয়ে দুভাগ করা। ভেতরেরখানা ছোট, মালিক মিস্টার চৌধুরী স্বয়ং বসেন। ইণ্টারভিউ সেখানেই হলো। এদিকের আধখানায় একপাশে বসে একটি মাদ্রাজি ছেলে, তার একটু ওদিকে আমার টাইপরাইটার। ভাবনা হয়েছিল যথেষ্ট। এই তো একরত্তি অফিস, কদিন থাকবে চাকরি কে জানে?

পরে একটু একটু করে খবর পেলাম সব। মিস্টার নায়ার কথাবার্তা বলেন না বেশি, তবে বেয়ারা পিওন তিনটির মধ্যে বুড়ো মতন যে লোকটি বাঙালী, বকতে পারে খুব। বললে, কারবার এদের সত্যিই খুব ফলাও তবে আসল কেন্দ্রটা হলো পোস্তায়। আড়ৎ রয়েছে সেখানে মস্ত আকারের, ব্যবসার গদীও সেখানেই। সারা ভারতের বড় বড় কারবারীদের পশ্চিম বাংলার কমিশনড্ এজেণ্ট এঁরা। এছাড়া বার্মা থেকে শীতের এই সিজনে সীড-পটেটো আমদানির লাইসেন্স রয়েছে মোটা অঙ্কের। সেই কাজ নিয়েই সকলে ব্যস্ত এখন। একজন

অংশীদার। নাম শুনলুম মজুমদার সাহেব, রেঙ্গুনেই রয়েছেন বর্তমানে, এই কাজ নিয়ে।...ডেলহৌসি স্কোয়ার অঞ্চলের এ অফিসটা অবশ্য একেবারে হাল আমলের। এখানে এঁরা ল্যাণ্ড কাস্টমসের ক্লিয়ারিং এজেন্ট। তবে এ কাজটি এখনো প্রায় অঙ্কুরেই। এছাড়া মিস্টার চৌধুরী শুনলুম সুবিধে মাফিক শেয়ারের স্পেকুলেশন্ও করে থাকেন। নায়ার যে ঘণ্টাখানেকের জন্যে নিচে নেবে যান রোজ, সেটা নাকি এই ব্যাপারেই, তবে মিস্টার চৌধুরীর ব্যক্তিগত কাজ এটা, ফার্মের লাভ লোকশান জড়িয়ে নেই এর সঙ্গে।

আরও একটা তথ্য জানা গেল। অনীশদা না কি এঁদের বাড়ির জামাই।

গত বৃহস্পতিবার ঠিক ছুটির সময়টিতে বলা নেই কওয়া নেই বৃষ্টি হয়ে গেল এক পশলা। অথচ এক আকাশ বিকেলের রোদ্দুর, মেঘের চিহ্নটুকু ছিল না কোনখানে।

মিস্টার চৌধুরী তখন ছিলেন অফিসে। ওঁর গাড়িতে আমাদের পৌঁছে দেবার প্রস্তাব করলেন।

নায়ার শুনে খুব খুশি, উঠে দাঁড়িয়ে কোটের মধ্যে হাত গলাতে লেগে গেলেন। আমি অল্প সঙ্কুচিত হয়ে পড়লুম, এই তো বেরিয়েই বাস ধরবো, দরকার কি ওঁর কষ্ট করে!

উনি কিন্তু ভাবনার অবসর দিলেন না। বললেন, উঠুন তবে।

উঠলুম।

নিচে নেমে এলুম তিন জনে।

নায়ার গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভারের পাশের সীটটি দখল করলেন। ভেতরে আমরা দুজনে।

বাইরে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে এখনো। এদিকে গাড়ির ভেতরে গরমও যথেষ্ট। মিস্টার চৌধুরী কাচ দুখানা নামিয়ে দিলেন। ভিজে হাওয়ার একটা ঝাপটা এসে ঠাণ্ডা সুড়সুড়ি বুলিয়ে গেল সারা মুখে।

নায়ারের পথ আর কতটুকুই বা, বৌবাজার আর চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউএর ঠিক মোড়টিতে পৌঁছে ধন্যবাদ জানিয়ে নেমে গেলেন ভদ্রলোক।

তারপরে গাড়ি সিধে চললো। বৃষ্টি এদিকটাতে বেশ চেপেই হয়ে গিয়েছে মনে হলো। রাস্তার দুদিকে এখনো জল জমে রয়েছে অল্প বিস্তর। আরও খানিক এগিয়ে বিবেকানন্দ রোডের মুখে পূবে ঘুরলো গাড়ি, তারপরে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে পড়ে আবার উত্তরে!

মিস্টার চৌধুরী সারা রাস্তায় কথা বললেন অল্প। তবে ওরই মধ্যে দুএকটা টুকরো টুকরো কথায় বাবার শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ নিলেন,···পরোক্ষে স্ট্রাইকওয়ালাদের গাল দিলেন,···নেহেরুর পাকিস্তান পলিসির গলদ দেখালেন। সব শেষে প্রশ্ন করলেন, আপনি শুনেছি এ, আই আর-এ গান করেন মাঝে মাঝে? অনীশ বলছিল।

আমি অল্প হেসে চুপ করে রইলুম।

—এর পরে কবে আছে আপনার গান?

—এই তো ডিসেম্বরের একুশে গেয়েছি। ডাক পড়তে আবার সেই ফেব্রুয়ারির শেষ।

—কি গানের প্রোগ্রাম করেন আপনি, ক্ল্যাশিকাল?

—না, বাংলা গান। রবীন্দ্রসংগীত, অতুলপ্রসাদের গান, এই সবই গেয়ে থাকি। ভজনও জানি দুচারখানা। কিন্তু গানের কথা তুলে

লজ্জা দেবেন না আমাকে! মার গলায় শুনে শুনে শিখেছিলুম কথানা, নইলে নিয়ম মতো শিখতে শুরু করেছি সবে এই বছরখানেক।

—বাঃ! তবে তো আরও বেশি করে বলা উচিত। মাত্র এক বছর সাধনা করে রেডিওতে চান্স পাচ্ছেন, এতো কম কথা নয়!

হেদুয়া পার হলুম। আর একটু গিয়েই আমাদের গলি।

আমি গলির মুখে রাখতে বললুম গাড়ি।

উনি বললেন, সে কি? চলুন ভেতরে ঢুকি, গলি তো তেমন সরু নয়।

ঠিক যে ভয়টি ছিল মনে। বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বললুম, না, না, মিথ্যে আপনি কষ্ট করবেন কেন? বৃষ্টি তো থেমেই গিয়েছে।…উনি জবাব দেবার আগেই গাড়ির দরজাটা খুলে দিলুম।

কি একটু ভাবলেন মিস্টার চৌধুরী। বললেন, আচ্ছা আসুন তবে। শ্লিপার পায়ে বেরিয়েছেন, শাড়িটা কাদা মাথামাখি হবে কিন্তু!

—ও কিছু না, একটুখানিই তো পথ। নমস্কার জানিয়ে আমি একটু হাসলুম।

ভাগ্যে গাড়ি ঢোকাননি ভেতরে! সৌজন্যের খাতিরে নামতে অনুরোধ করতুম নিশ্চয়! কিন্তু ডাকতুম কোথায়, একতলার ঐ অন্ধ ঘরে? বসাতুমই বা কোথায়, একখানা চেয়ার, তারও তো হাতলখানা ভাঙা! চা-টুকু পর্যন্ত নেই বাড়িতে, আজই ফেরার সময় আনার কথা ছিল।

দারিদ্র তো আছেই। লোক ডেকে দেখাতে লজ্জা করে!

বাবা ফিরলেন একটু পরেই। বললেন, চা নেই, কই বলে যাসনি

তো? আমি হাঁৎড়ে মরি! মোড়ের দোকানে বসে ছিলুম, দেখি মস্ত গাড়ি থেকে নামলি। কার গাড়ি রে?

বললুম, গাড়িতে আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন, উনিই তো সমীর চৌধুরী। যাঁর ফার্মে কাজ করছি আমি। ঠিক ছুটির সময়টিতে জল নামলো, ওঁর বাড়িও এদিকেই আরও খানিকটা এগিয়ে, তাই নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

—তবু ভাল, আমি ভাবি তোর সেই থিয়েটারের দলের কেউ বুঝি?

ঐ এক নতুন জ্বালা হয়েছে আমার! থিয়েটারের দল মানে আমাদের "আকাশ প্রদীপ"। বাবা একেবারেই দেখতে পারেন না ক্লাবটাকে।

সাধ করে কি ঢুকেছি ওদের দলে? সিনেমার তনুকা সেন, ও আগে কাজ করতো আমাদের এক্সচেঞ্জে। মাঝে মাঝে আসে এখনো পুরোনো সখিদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে। একদিন পরিচয় হয়ে গেল ভাগ্যক্রমে। সেই থেকে আর সবার মতো আমারও নুকাদি ও। ওর কথাতেই না আকাশ-প্রদীপে এলুম। নতুন নৃত্যনাট্যের রিহার্সল চলেছে,—'ফাগুন লেগেছে বনে'—মার্চের শেষে নিউ-এম্পায়ারে নামানো হবে। আমার তাতে তিনখানা সোলো গান, পার্টও রয়েছে একটুখানি। অরুণ লাহিড়ী, ক্লাবের যিনি ফাউণ্ডার প্রেসিডেন্ট, শুনি না কি ফিল্ম-লাইনের ইন্দ্র-চন্দ্র বিশেষ। একটিবার যদি প্লে-ব্যাকে গাইবার চান্স পাই কোথাও, নুকাদির ধারণা একদিনে দিগ্বীজয় করে ছাড়বো আমি! ভয় ভাবনারও বিশেষ নেই এতে, মিউজিক ডিরেক্টার-দের কাছে ট্রেনিং নেবো, রেকর্ড করে টাকা নিয়ে বাড়ি চলে আসবো। শুধু কণ্ঠকড়ি সম্বল করে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করছে আজকাল কত ছেলে কত মেয়ে। আমিও তাদের মতো হবো, যা কিনতে ইচ্ছে

করে মুঠো মুঠো কিনবো, বাবার দারিদ্র ঘোচাবো, ভাবতেও কাঁটা দেয় গায়ে !

এদিকে বাবাকে নিয়েই মুস্কিল। দিনকে দিন কি যে সন্দেহ বাতিকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছেন। চোখের মনি ছিলুম, এখন শুধু কথায় কথায় অবিশ্বাস আর গঞ্জনা।

আহা, ভুগছেন কি কম ?

রেঙ্গুন সিজন শেষ হলো।

দুপুরে নায়ার গিয়েছিলেন পোস্তায়। বললেন, ওখানে এখন ভাঙা হাট। এ মরশুমের লাভের মোটামুটি হিসেব-নিকেশ চলছে। ছোট সায়েব মজুমদার ফিরেছেন আজই ভোরে, হয়তো চৌধুরী সায়েবের সঙ্গে বিকেলের দিকে আসতেও পারেন অফিসে।···মাঝে কদিন এমন কাজের চাপ গিয়েছে বলার নয়। দিন দশেকের মধ্যে মিস্টার চৌধুরীতো একটি বারের জন্যেও আসতে পারেন নি অফিসে। যা কিছু কাজ টেলিফোনে নির্দেশ দিয়েছেন। ক্লিয়ারিং সরকারদের পর্যন্ত পোস্তা অবধি গিয়ে দেখা করে আসতে হয়েছে ওঁর সঙ্গে।···তারপর শেষ স্টীমার পৌছেচে গত বুধবার। এবারের সিজন এই সঙ্গেই খতম।

পৌণে চারটের সময় বেয়ারা নিচে থেকে এসে খবর দিলে, আসছেন ওঁরা।

প্রথমে ঢুকলেন মিস্টার চৌধুরী। পিছনের দীর্ঘদেহী ভদ্রলোকই বুঝলুম ছোটসাহেব সুনন্দন মজুমদার। বয়সে ছোট সায়েবকেই বড় মনে হয়।

নায়ার উঠে স্বাগত জানালেন।

আমি ফার্মে নতুন ঢুকেছি। বোধ করি সেই জন্তেই ভেতরের ঘরে ঢোকার আগে আমার টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন মিস্টার চৌধুরী; পরিচয় করিয়ে দিলেন।

দুহাত জোড় করে নমস্কার জানালুম।

জানি না মনের ভ্রম কি না, ভদ্রলোক যেন অপার বিস্ময়ে চমকে উঠলেন আমাকে দেখে।

একটি কি দুটি কথার বিনিময় হলো। চোখ তুলে দেখি আমারই দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন মিস্টার মজুমদার। সে চাউনি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম আমি। সন্ত পরিচিতা মেয়ের দিকে এমন নির্লজ্জ তাকাতে পারে কোন পুরুষ, ধারণাই ছিল না এর আগে।

দুজনে পার্টিশনের ওধারে চলে গেলেন। পিছু পিছু নায়ার, বশম্বদ ভঙ্গিতে।

রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। উনি কি পূর্ব পরিচিত আমার?···কোথাও কি দেখা হয়েছিল ওঁর সঙ্গে অন্ত কোনখানে?··· ওঁর সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল কি আমায় এর আগে আর কখনো?

মনে পড়ে না তো!

চার

অনীশের কথা

সাত আট বছরে যে মানুষের চেহারা এতখানি বদলে যেতে পারে, সদাপ্রসন্ন বাবুকে না দেখলে বিশ্বাস হতো না আমার। চল্লিশে যাঁকে শক্তিতে সামর্থে প্রায় যুবক দেখেছি, পঞ্চাশ পেরোবার আগেই সে ব্যক্তি বার্দ্ধক্য লাভ করবে, ভাবতেই পারা যায় না। চোয়ালের হাড় দুটা উঁচু হয়ে ঠেলে উঠেছে, চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট। মেজাজটাও রীতি-মতো তিরিক্ষি, দুর্বাসা মুনির প্রায় কাছাকাছি যায়। মাথার চুলের বারো আনাই ধবধবে শাদা, যা দেখলে অতি বড় শান্তিবাদীরও সন্দেহ জাগবে, শ্বেত রঙ সব সময়েই শান্তির প্রতীক কি না!

আগে যেদিন আসি বাঁশরীর কাজের খবর নিয়ে, বাড়ি ছিলেন না উনি। আজ এলুম তো বাঁশরীর দেখা নেই। শনিবার ওদের ছুটি হয় তো জানি তিনটেয়, বোধ হয় আটকে পড়েছে কোথাও।

সদাপ্রসন্ন বাবু মেয়ের ওপর প্রসন্ন নন তেমন। কথার ফাঁকে ফাঁকে ঝাঁঝটা ফুটে বেরুতে লাগলো। বললেন, মেয়েরা যখন কড়ি কুড়োতে ঘরের চৌকাঠ ডিঙোয় তখনই জানবেন হিতে বিপরীত অবশ্যম্ভাবী। কত পাপ ছিল মশাই, মেয়ের রোজগারে সংসার চলছে এই দুমাস। গলা দিয়ে অন্ন নামে না, কি করবো পোড়া পেট তো ভরাতে হবে! মাঝে মাঝে ভাবি সব ছেড়েছুড়ে কোমরে একখানা গেরুয়া জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ি। মজা দেখুন, তাও আবার পারি না!

অবস্থা হয়েছে সেই,—"আলম্বমানঃ স পুমান্ ধারাং পিবতি সর্বদা"। মহাভারতের বিদুরের সেই গল্পটা জানেন তো ?

গল্প শোনার অবসর ছিল না, কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে শুধোলুম আপনাদের স্ট্রাইক মিটছে কবে ?

—কে জানে কবে ওনাদের মর্জি। মিটলেই বা কি, ওখানকার কাজ আমার জন্যে নয়। আসল কথা কি জানেন, স্কুল মাস্টারি করে করে ভোঁতা মেরে গিয়েছি, অন্য কোন কাজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারি না নিজেকে। তাও তো পেয়েছিলুম স্কুলেরই কাজ একটা, মাইনেও মন্দ ছিল না। হতভাগা কান দুটো যে বাদ সাধলে, গেলুম বদ্ধ কালা হয়ে। আমি এদিকে বই খুলে পড়া বোঝাই, বাছাধনেরা ওদিকে চিৎকার করেন তারস্বরে। তা করিস্ কর, একটু রয়ে সয়ে তো করবি! তা নয়, শেষটা একেবারে মেছোহাটা বসিয়ে ছাড়লে। ক্লাশ নাইনের পাশেই হেডমাস্টারের ঘর, ব্যস, জবাব হয়ে গেল একদিন। অপরাধ, ক্লাশ ম্যানেজ করতে পারছি না।

শ্রবণশক্তি যাঁদের কম, বক্তা হতেই নাকি তাঁদের বেশি পছন্দ! সদাপ্রসন্ন বাবুর ক্ষেত্রেও কথাটার ব্যতিক্রম দেখলুম না। আমার ছোট্ট একটি প্রশ্নের উত্তরে গড় গড় করে এতগুলি কথা বলে দম নেবার জন্যে থামলেন উনি। তাও যে ইচ্ছে করে থামলেন তা নয়, কাশির একটা প্রবল দমক এসে থামতে বাধ্য করলে ওঁকে।

আমি ঘাড় নেড়ে সায় বোঝাবার চেষ্টা করছিলুম।

একটু সামলে নিয়েই আবার শুরু করলেন। বললেন, দেখি, সরকার তো উদ্বাস্তুদের জন্যে অনেকগুলো প্রাইমারি স্কুল খুলছেন, দেবো দরখাস্ত পাঠিয়ে। মাইনে খুবই কম যদিও, তা কি করা যাবে আর!

বাচ্ছা ছেলেগুলো তবু তো একটু ভয়-ডর করে চলবে? তুটো ক্লাশ ফোরের ছেলেকে পড়াই, দেখেছি কি না!

ব্যথাটা কোথায় বুঝতে দেরি হয় না। প্রসঙ্গ বদলাতে বাঁশরীর কথাতেই ফিরে এলুম আবার। দেয়ালে ঝোলানো তানপুরোটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললুম, বাঁশরীতো স্থন্দর গাইছে আজকাল।

উনি জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

কথাটার পুনরাবৃত্তি করলুম। এবার বেশ উচ্চ স্বরে।

বললেন, হ্যাঁ তা গায় মন্দ না। ওর মা যে ভারী স্থন্দর গাইতো কি না! তার কাছ থেকেই পাওয়া তো!

যেন উন্মনা হয়ে পড়লেন সদাপ্রসন্ন বাবু, কি একটু ভেবে নিলেন। বললেন, গানের কথা তুললেন, তা সে দিক থেকেও এক আপদ জুটেছে পিছনে। একটা প্রাইভেট থিয়েটারের দল, মেয়েটাকে ওরাই ঘরছাড়া করবে শেষ পর্যন্ত! মুস্কিল কি জানেন, মা তো নেই ওর, আমি বাপ হয়ে খোলাখুলি সব কথা আলোচনাও করতে পারি না। আর করলেই বা শুনছে কে?

শুধোলুম, থিয়েটারের দল মানে?

—বলবেন না আর! থিয়েটারের দল বললে ওদের আবার গায়ে ফোস্কা পড়ে। নতুন সব কথা উঠেছে। বলে, কলা,…কৃষ্টি… সংস্কৃতি। আরে মশাই, অরুণ লাহিড়ী যে দলের কর্তা আর তন্নুকা সেন সেক্রেটারি, সে দলের কলা মানে যে স্রেফ কাঁচকলা তা ঐ হাবা মেয়েকে বোঝায় কে? বলে, ওরা নাকি সিনেমায় আড়াল থেকে গাইবার চান্স দেবে! সোনার হরিণ ধরার নেশায় মেতেছে মেয়ে আমার। আরে ওর সে সোনাটাও মিথ্যে হরিণটাও মিথ্যে, পাবি কি?…বলি, তন্নুকা সেনকে চেনেন তো?

অজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হলো। বললুম, অরুণ লাহিড়ীর নামটা শোনা বটে, উনি তো বেশ নাম করা চিত্র পরিচালক।

—ঘণ্টা!

—ঘণ্টা?

—আবার কি? মেয়ে মজাবার কাম্ন একটি। তনুকা সেনটিও জানবেন সাংঘাতিক মেয়ে। ঐ যে 'স্বপ্ন-শেষ' ছবিতে ছোট্ট এক টুকরো টাইপ রোল করে সকলের বাহবা কুড়োলে! এই তো বছর খানেক নামছে মোটে।

চুপ করে রইলুম। ছবি দেখি অল্পই, বাংলা ছবি আরও কম। খুব জলজলে দু-একটা তারার নাম জানি, এই মাত্র। সদাপ্রসন্ন বাবু দেখলুম এ লাইনের খবরাখবর রাখেন বেশ!

হঠাৎ উসখুস করতে লাগলেন উনি। সন্ধ্যে হয়ে এলো, বুঝলুম টিউশনির সময় হয়ে এসেছে। বললুম, আজ আমি উঠছি, বাঁশরী এলে বলবেন।

—উঠবেন? দেখুনতো কাণ্ড মেয়ের। আপনি পরিবারের কত বড় হিতৈষী, এলেন দয়া করে, একটু চা অবধি দিতে পারলুম না।

—না না, তাতে কি! ব্যস্ত হবেন না আপনি, পরে আবার আসবো'খন অন্যদিন।

—অপেক্ষা করুন তবে, আমিও বেরুবো। গলিটুকু দুজনে এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।

ভেতরে চলে গেলেন। মিনিট তিনেকের মধ্যেই ফিরে এলেন আবার। ঘরের এক কোণে দাঁড় করানো আলনা থেকে আলোয়ান খানা টেনে নিয়ে কাঁধে ফেললেন।

আমি ঘরখানার এদিক ওদিকে চোখ বোলাচ্ছিলুম। স্বল্প জিনিসপত্র

যা ছিল বহু আগেই দেখা হয়ে গিয়েছে যদিও। চেয়ার ঘরে একখানাই, বর্তমানে তা আমারই দখলে। ওধারে বড় চৌকি একখানা যার ওপর বসে সদাপ্রসন্ন বাবু বাক্যালাপ করছিলেন এতক্ষণ, তার তলায় উল্লেখযোগ্য রকমের বড় আকারের পিকদানি একটি। এই আধঘণ্টায় যেটিকে বার পাঁচ ছয় ব্যবহার হতে দেখলুম। রাস্তার দিকে জানলার নিচে বেতের টেবিল একখানি, ওপরে সাজানো খান কয় বই, টাইমপিস ঘড়ি, আরও দুচারটি টুকিটাকি। ঘরের মধ্যে এই টেবিলটিই সবচেয়ে সৌখীন আসবাব, ঢাকাটিও সুদৃশ্য কারুকার্য মণ্ডিত। ভেতরের দিকে জানলাটি খুব সম্ভব খোলা হয় না, কারণ তারই কোলে পর পর সাজানো একটি বড় তোরঙ্গ, হারমোনিয়মের বাক্স একটি এবং সর্বোপরি একটি চামড়ার স্যুটকেশ। দেওয়ালে হুকে টাঙানো মাঝারি আকারের তানপুরা একটি, তাতে গৈরিক বর্ণের ঢাকা পরানো। পিছনের দেওয়ালে টাঙানো সুদৃশ্য একখানি ক্যালেণ্ডার। অর্জুনের সুভদ্রা হরণ, তার পাশেই পর পর সাজানো দুখানি ফটো। একটিতে বাঁশরী, অন্যটি সদাপ্রসন্ন বাবুর। মাঝখানে আরো একটি ছবি ছিল বোধ হয়, হুকে জড়ানো রয়েছে হলুদ রঙের নকল একগাছি মালা।

আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে সদাপ্রসন্ন বাবু বললেন, কি দেখছেন, বাঁশীর মায়ের একখানা ছবি টাঙানো ছিল মধ্যিখানে। কদিন আগে ঝড়ে ছিঁড়ে পড়ে কাঁচখানা ভেঙে সহস্র টুকরো হয়ে গেল। তুলে রেখেছে বাঁশী তোরঙ্গে, মাস কাবারে বাঁধাতে দেবে। ঐ একখানিই ছবি আছে ওর, মারা যাবার ঠিক দিন সাতেক আগে কি যে খেয়াল হলো জোর করে তোলালে। জানতে পেরেছিল আর কি! প্রায় দেড় যুগ এক সঙ্গে ঘর করে গেল, রোগ হলো তো দেড়টা দিনও রইল না?

একখানা ছবি গুঁজে দিয়ে ভুলিয়ে পালালো !···তবে আসে। সপ্তায় দুদিন করে আসে এখনো। সুখ দুঃখের কথা বলে।

অবাক হয়ে ওঁর চোখের দিকে চাইলুম।

—বুঝতে পারলেন না তো ? মিটি মিটি করে হাসলেন সদাপ্রসন্ন বাবু। হ্যাঁ আসে, মানে প্ল্যানচেটে ডাকলেই আসে। সতী সাধ্বী ছিল, এই এক বছরের মধ্যে উঠে গিয়েছে একেবারে পঞ্চম স্তরে। বলি মানেন তো এ সব ? না কি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে থাকেন সব কিছু ?

শোকগ্রস্ত প্রৌঢ়কে জবাব দেবো কি, হ্যাঁ না কিছুই না বলে ছবিদুটোর দিকেই তাকালুম আবার।

সব সত্যি মশাই, সব সত্যি ! পরে যেদিন আসবেন, আমার খাতাখানা দেখাবো'খন আপনাকে। যা বলে, পরে ফেয়ার কপি করে তুলে রেখে দিই কি না !

আমি একটু হাসলুম।

উনি হাঁকলেন, রমেন—।

বছর পনেরোর ছেলে একটি, পরনে হাফ প্যাণ্ট, সাড়া দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো।

বললেন, বেরোচ্ছি আমি, ফিরবো সাড়ে আটটায়। চাবিটা তোর মার কাছে রেখে দিবি, বাঁশীদি এলে দেবে।

আমার দিকে ফিরে যোগ করলেন, এ ছেলেটি আমাদের পাশের ঘরের ভাড়াটে অক্ষয় বাবুর। পড়াশুনোয় ভারী মন, পরের বার স্কুল ফাইন্যাল দেবে !

শুধোলুম, তোমার নামটি কি ভাই ?

ছেলেটি লাজুক খুব। লজ্জায় এঁকে-বেঁকে মাটির দিকে তাকিয়ে

শেষে হঠাৎ মরিয়া হয়ে বুক টান করে বললে রমেন্দ্র সুন্দর ঘোষ।

সদাপ্রসন্ন বাবু শুধরে দিলেন, নামের আগে শ্রী বলতে হয়।

বাইরে এলুম। নেমে রাস্তায় দাঁড়ালুম। সদাপ্রসন্ন বাবু খিল দিয়ে ভেতরের দরজায় চাবি দিলেন, তারপর উঠোনের পাশে সিঁড়ির তলার প্যাসেজ দিয়ে বাইরে এসে বললেন, চলুন যাওয়া যাক।

গলির মুখে এসে আমি বাসের জন্যে দাঁড়ালুম। বললুম, ছাত্রের বাড়ি কোন দিকে আপনার?

—ছাত্রের বাড়ি? সে তো এখন নয়, সকালে। যাবো একটু সিনেমা দেখতে, পূর্ণশ্রীতে এসেছে 'নাগিন'। আহা, বাঁশী বাজিয়েছে বটে ছোকরা! গ্র্যাণ্ড কেবিনের রাধহরি বাবু তাই বলছিলেন, আমাদেরই বুকের মধ্যে আনচান করে ওঠে, মেয়েগুলোর তাহলে কি হয় ভাবুন একবার?···দেখি গিয়ে লাইনে দাঁড়াই, যদি বরাতে টিকিট মেলে।

আজ দেখছি শুধু অবাক হবার পালা। বললুম, সে কি? এই যে বললেন শরীর ভাল না আপনার। সকালে শুধু খান কয় সুজির রুটি খেয়েছেন? এর ওপব গিয়ে লাইনে দাঁড়াবেন, কষ্ট হবে না?

—তা কি করতে বলেন? বেশি দামের টিকিট কেনা সাধ্যের বাইরে। অথচ নেশা দাঁড়িয়ে গিয়েছে এদিকে।·· প্রতি শনিবার এক-খানা করে ছবি বাঁধা। কোন হপ্তায় দুখানাও হয়ে যায়। তবু তো কত বেছে বেছে দেখি, আজে-বাজে ছবি দেখে দেখে পয়সা নষ্ট করতে গা কম্ কম্ করে। স্রেফ হিন্দি ছবিতে যাই, ও বাংলা

ছবির কান্নাকাটি প্যানপ্যানানি সইতে পারি না মোটে। জীবনে সুখের মুখ দেখলুম না কোনদিন, ছবিতে কেমন ওরা হাসে নাচে গান করে, বড় বড় মোটর গাড়িতে বসে ভালবাসার ফষ্টি নষ্টি করে, দেখেও সুখ!···ছেলেবেলায় মামার বাড়ি যেতুম মার সঙ্গে। দিদিমাকে ঘিরে শুতুম নাতি নাতনীরা, রূপকথার গল্প শুনতুম। রাজপুত্র, পক্ষীরাজ, সোনার কাঠি রাজকন্যা,···ঘুমের মধ্যেও রোমাঞ্চ লেগে থাকতো! এও সেই রকম, বুড়ো বয়সের রূপকথা। এত সস্তায় এই বাজারে এত মজা এক সিনেমাওয়ালারাই দিয়ে যাচ্ছে। কি বলেন?

বলবো আর কি! চলে গেলেন উনি। স্টপেজে দাঁড়িয়ে ওঁর কথাগুলোই বার বার মনে হতে লাগলো। রাষ্ট্রনীতির কূটচালে এক দেশ ভেঙে দুখানা হয়, আর অমন কত শত সদাপ্রসন্ন বাবু সদাবিষণ্ণতার অতলে ডোবেন তার স্ট্যাটিষ্টিক্স কে রাখে?

দুঃখ মানুষকে সংগ্রাম করতে শেখায়, কিন্তু বোধহয় সব মানুষকে নয়। কেউ কেউ একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, জীবনের দিকে পিছু ফিরে উল্টো মুখে হাঁটে। প্ল্যানচেটে আত্মা নামায়, সিনেমার কিউয়ে দাঁড়িয়ে পক্ষীরাজের স্বপ্ন দেখে! এতো কি, আরও কত নিচে নামে। কতটুকু জানি!

প্রথম বাসখানা ছেড়ে দিতে হলো, অসম্ভব ভিড়। দ্বিতীয়টি সবে দৃষ্টিগোচর হয়েছে, পরিচিত হর্ণ শুনে ফিরে তাকালুম। দেখি সমীরের গাড়ি, ঢুকছে বাঁশরীদের গলিতে। বাঁশরীও রয়েছে পাশেই।

ভাবলুম, ওরা দেখতে পায়নি আমায়, কিন্তু না, ভেতরে ঢুকে হাত কয়েক এগিয়েই দাঁড়িয়ে গেল গাড়ি।

সমীর মুখ বাড়িয়ে হাঁক দিলে, এই, অনীশ—।

ফিরতে গেলে এ বাসখানাও ছাড়তে হয়। অথচ বাঁশরী বুঝেছে নিশ্চয়, ওর বাড়িতেই এসেছিলুম। দেখা না করে গেলে দুঃখ করবে বেচারি। সমীরই বা ভাববে কি? অগত্যা ফিরে ওদের গাড়ির কাছে যেতেই হয়।

—রাগ করেছেন তো আমার ওপর? শুধোলে বাঁশরী।

—কিছু না। তোমার বাবার সঙ্গে আলাপ করছিলুম এতক্ষণ, এইমাত্র চলে গেলেন তিনি।

—দেখুন না, এত দেরি করিয়ে দিলেন সমীরবাবু!

ঘড়ি দেখে সমীর উত্তর করলে, খুব বেশি দেরি আর কই, ছটাও বাজেনি এখনো।

আমার দিকে ফিরে বললে, আমাদের শীতাংশুর বিয়ে সামনে বুধবার, খবর পেয়েছো নিশ্চয়! ভাবছিলুম ওর বৌকে একখানা বেনারসী প্রেজেন্ট করবো। মিস রায়কে তাই নিয়ে গিয়েছিলুম কমলালয়ে। আমার পছন্দ অপছন্দ দুইই সমান, সে তো তুমি জানোই।

জানা ছিল না আমার। সুতরাং নিরুত্তর রইলুম।

—দেখুন তো কি অন্যায়, আমার জন্যেও একখানা শাড়ি নিলেন সমীরবাবু।

বাধা দিয়ে সমীর ডাকলে, উঠে এসো ভেতরে।

—দেরি হয়ে যাবে ভাই।

—এসো তো তুমি।

বাঁশরীও বার বার করে বলতে লাগলো, ঠেলা গেল না।

গাড়িতে সমীর জিজ্ঞেস করলে, তুমি কি দিচ্ছ শীতাংশুর বিয়েতে?

—ঠিক করিনি কিছু। ভেবে তো ছিলুম কয়েকখণ্ড রবীন্দ্র রচনা-

বলী দেবো, কনের যখন অনার্স ছিল বাংলায়, জয়ন্তীর কিন্তু ইচ্ছে হাল্কা দেখে একখানা গহনা দেওয়া হোক।

বই ছাড়া কিছুই চিনলে না আর। সমীরের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য।

বাড়ির সামনে এলে গাড়ি রাখতে বললে বাঁশরী। বুঝলুম সমীর আজই প্রথম এলো এখানে।

সেই লাজুক ছেলেটি রোয়াক থেকে নেমে এসে দাঁড়ালো, যার নাম শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রসুন্দর। গাড়িটা দেখলে, সমীরের দিকে তাকালে, আমার দিকেও তির্যক চোখে চাইলে একবার, তারপর চাবিটা বাঁশরীর হাতে দিয়ে অদৃশ্য হলো ভেতরে।

বাঁশরী ভেতরে গিয়ে দরজা খুলে দিলে। আমরা ঘরে ঢুকলুম। পূর্ব অধিকৃত সেই হাতল বিহীন চেয়ারখানা উধাও হয়েছে ইতিমধ্যে, পরিবর্তে দুখানা অপেক্ষাকৃত নতুন চেয়ার পাশাপাশি রাখা, হয়তো রমেন্দ্রদের ঘর থেকেই আনা। আমাদের বসিয়ে চলে গেল বাঁশরী পাশের ঘরে. বেরিয়ে এলো যখন, দেখি বেশ পরিবর্তনের কাজটাও সেরে এসেছে। পরনে ছিমছাম একখানি ডুরে শাড়ি। ইতিমধ্যে স্টোভে পাম্পের শব্দও পেয়েছি ওঘরে, বুঝেছি চায়ের জল চাপানো হয়েছে।

বললে. সত্যি করে বলুন তো দাদা, নিশ্চয় মনে মনে রাগ করে চলে যাচ্ছিলেন আমার ওপর ।

হেসে উত্তর দিলুম, অত চট করে রাগে না তোমার দাদা। তবে তোমার বাবাকে যেন ঈষৎ বিরক্ত দেখলুম।

—ভারী অন্যায় হয়ে গিয়েছে, এত দেরি হবে একটুও ভাবতে পারিনি। বাবার শরীরটা খারাপ যাচ্ছে কিনা, খুবই অসুবিধে হয়েছে বুঝতে পারছি।

শাড়ির প্যাকেটটা খুলতে খুলতে বললে, দেখুন কতগুলো টাকা আমার জন্যে মিছে মিছি নষ্ট করলেন সমীর বাবু।

—বাঃ, সুন্দর কিন্তু শাড়িখানা! তোমাকে চমৎকার মানাবে।

লজ্জায় ওর গালে লালের আভা দিল।

সমীর বললে, কেমন, বলিনি আগে? জানো অনীশ, মিস্ রায়ের শাড়িখানা আমি নিজে পছন্দ করে কিনেছি।

ওর পছন্দ অপছন্দের কথায় এবারও মন্তব্য করলুম না আমি। শুধু বললুম, শীতাংশুর বৌ-এর বেনারসীটা দেখালে না তো?

—ঐ দেখো, গাড়িতেই রইল সেখানা। চলো, তুমি তো যাবেই গাড়িতে।

বাঁশরী শাড়িখানা মুড়তে মুড়তে বললে, এই চাঁপা রঙটিই নাকি সমীর বাবুর সব চেয়ে প্রিয়।

—না কি?

—হ্যাঁ। আমার পছন্দ লাল রঙ। আচ্ছা দাদা, আপনার?

মুস্কিলে পড়লুম। বিশেষ করে কোন রঙটির ওপর পক্ষপাতিত্ব আমার কিছুতেই তা স্থির করতে পারলুম না। ও-নিয়ে তো ভাবিনি কখনো আগে! তবে লাল রঙের শাড়ি পরলে জয়ন্তীকে দেখে রক্তে যেন ঝিম ঝিম লাগে এইটুকু বেশ জানি। কিন্তু একটুতো তফাৎ রেখে বলতে হবে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল আমি সবচেয়ে ভালবাসি কোন্ রং জানো? কচি কলাপাতার মতো ফিকে সবুজ রং।

সমীর সহাস্যে বাধা দিলে। বর্ণপরিচয় থাক এখন, চায়ের জলটা বুঝি ফুটে ফুটে মরেই গেল ওঘরে।

—ও মা, ভাগ্যি বললেন! দৌড় দিল বাঁশরী।

সমীরের সঙ্গে আজ যেন জমছে না ঠিক। বললুম, কি রকম মুনাফা রইল এ বছর?

—যতটা রটছে অতটা নয়।

—কিছু তো বটে?

—তা অন্য অন্য বারের চেয়ে ভাল এবার।

—তোমার সেই বন্ধু সুনন্দন মজুমদারের খবর কি?

—ভালই। তোমার ঠিকানাটা মাঝখানে নিলে একদিন। গিয়েছিল না কি?

—কই না!

বাঁশরী ঢুকলো চা নিয়ে, অনুসঙ্গী কয়েকখানা বিস্কুট।···চায়ে চুমুক দিতে দিতে খস্‌খস্‌ শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকালুম। অনুভব করতে লাগলুম ভেতরের উঠোনের দিকে দরজাটার ফাঁক দিয়ে কাদের যেন কৌতূহলি দৃষ্টি এসে বিঁধছে আমাদের! এ বাড়িরই অন্য অন্য সরিকদের উৎসাহী কেউ হবে, যাচাই করে দেখছে কে মানুষ-জন এলো। সমীরের বে-ঢপ বিরাট গাড়িখানাই যে এবাড়ির অতিথিদের পক্ষে একেবারে বেমানান কিনা।

চা খাওয়ার শেষে তানপুরাটা দেখিয়ে সমীর যে অতঃপর গান শুনতে চাইবে আগেই ধরেছিলুম।

বিব্রত গলায় বাঁশরী বললে, আজ থাক, পরে অন্যদিন গাইবো ঠিক।

সমীর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করার আগেই বাধা দিয়ে বললুম, হ্যাঁ, সেই ভাল কথা, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে আজ। পরে আর একদিন তোমার গানের অডিশন নেওয়া যাবে।

মৃদু হাসলে বাঁশরী।

গাড়িতে বসে বিরস গলায় সমীর বললে, মেয়েদের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় শিখলে না আজও।

—উদাহরণ দাও।

—ওরা চিরকালই একটু ফ্ল্যাটারি পছন্দ করে। বিশেষ করে গাইয়ে মেয়েদের তো কথাই নেই। আর দু-এক বার অনুরোধ করলে নিশ্চয় গাইতো বাঁশরী।

বাধা দিয়ে বললুম, না গাইতো না। গাইতে চাইলেও মানা করতুম আমি। সাতটা বেজে গিয়েছে, এখন ও আগুন ধরাবে, রান্না চড়াবে। বাপের যে-রকম তিরিক্ষি মেজাজ দেখলুম, সাড়ে আটটায় ফিরে যদি দেখে খাবার তৈরি নেই, ঐ তানপুরা আছড়ে ভাঙবে।

গুম হয়ে বসে রইল সমীর।

বাড়ি ফিরলুম, নটা বাজে।

জয়ন্তী অনুযোগ করলে, এত দেরি যে? একটা শনিবার নষ্ট করলে শুধু শুধু!

—বোলোনা আর। গিয়েছিলুম বাঁশরীদের বাসায়, তোমার দাদার সঙ্গে দেখা। দেরি করিয়ে দিলে।

—হঠাৎ ওখানে?

—হঠাৎ নয় ঠিক। মানে, প্রথম যেদিন যাই ওর বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি তো? তাই।

—সুনন্দন মজুমদার এসেছিলেন।

—তাই না কি? কখন?

—ঘণ্টাখানেক আগে। তুমি নেই শুনে চলে গেলেন।

—চা-টা দিয়েছিলে তো ?

—ঢুকলেনই না ভেতরে। বলে গেলেন দু-এক দিনের মধ্যে আসছেন আবার। বার্মা থেকে একটা উপহার এনেছেন তোমার জন্যে। রেখে গেলেন।

—বা—রে দেখাও ?

ঘরে ঢুকে দেখি টিপয়ের ওপরে রাখা তথাগতের একটি দারু মূর্তি। আর সুন্দর একটি সিগ্রেট কেশ।

পাঁচ

সমীরের কথা

গাড়ি তুলে গ্যারেজের গেটে চাবি লাগাতে বলে ভেতরে ঢুকলুম।

প্রথমেই দেখা আরতীর সঙ্গে। চেঁচিয়ে ডাকলে, মা দাদা ফিরেছে।…খুব ছেলে যাহোক! বেরিয়েছিলে সেই কোন্ ভোরে, আর এখন ঘড়িটা দেখতো! অমনি ওপরে গিয়ে আয়নায় নিজের মূর্তিটাও দেখো একবার!

উত্তর করলুম না।

—বুঝেছি, হেরে গিয়ে মন খারাপ হয়েছে বুঝি? এতো আগে থেকেই জানা কথা। হয় কে নয় করবে তোমরা, তাই না কি পারে কেউ? বাজির একশোটা টাকা কিন্তু দিতে হচ্ছে ঠিক, সে আমি ছাড়ছি না!

বললুম, কাল বিকেলে নিস। আর চেক পেলে চলে যদি তো বল্, এখনি দিচ্ছি।

—ও বাবা, একেবারে দাতাকর্ণ হয়ে পড়লে যে! কি ব্যাপার বল তো?

জ্যাঠাই মা নেমে এলেন।—এই যে ফিরেছিস? সারা দিন টো টো করে কি যে ঘুরছিস, শরীরটা কদিনে কি দাঁড়িয়েছে বল্ দেখি? নে, হাত-মুখ ধুয়ে আয় চট করে, ঠাকুরকে খাবার দিতে বলি আমি।

—এই যে আসছি।

ওপরে নিজের ঘরে এলুম। পকেট হাতড়ে দেখি সিগারেট নেই একটিও, টেবিলের ওপর টিনটা পর্যন্ত খালি। মাধোলালকে ডেকে এক টিন গোল্ড ফ্লেক আনতে দিলুম, তারপর বেতের ইজি-চেয়ারটা টেনে আনলুম বাইরের বারান্দায়। ভাবতে বসলুম।

কটা দিন কেটে গেছে ঝড়ের গতিতে, খেটেছি অবিশ্রাম। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা পর্যন্ত অবাক্, আমি হঠাৎ পলিটিক্সে নামলুম কি মনে করে?

সেদিন অনীশ ধরেছিল রাস্তায়। বললে, তোমার গাড়ি একটা তেরঙা সিল্কের ঝাণ্ডা উড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পাড়ায় পাড়ায়, উত্তর কোলকাতার উপনির্বাচনে খাটছো না কি খুব?

—খুব আর কোথায়, তবে অল্প-স্বল্প বলতে পারো।

—রাজনীতি নিয়ে মাতলে হঠাৎ? তাও আবার কংগ্রেসের হয়ে? নেহরুর নিন্দে না করে তো জল ছুঁতেনা সকালে।

প্রশ্ন করলুম, কেন তোমার ইতিহাস কি বল্লে? বিহার-বাংলা যদি হাত মেলায় আজ, আর সেই দৃষ্টান্তের ছোঁয়াও লাগে অন্য অন্য প্রদেশে, শুভ হবেনা দেশের?

—হয়তো হবে। ব্যক্তিগতভাবে আমারও তাতে আপত্তি নেই। বাংলা-বিহার, শুধু তাই বা কেন উড়িষ্যা-আসামও আসুক না এর মধ্যে। রাজ্যে রাজ্যে বিভেদ-বুদ্ধির কুশাঙ্কুর উঁচু হয়ে থাকলে সামগ্রিকভাবে মঙ্গল যে হতে পারেনা দেশের, ইতিহাস সে প্রমাণ বার বার নির্ভুলভাবে দাখিল করেছে।

—তবে?

—মুস্কিলটা কোথায় জানো? সেই সঙ্গে আর একটা কথাও বলে ইতিহাস। বলে যে সে একতাটা স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া দরকার। ওপর থেকে জোর করে চাপাতে গেলে উল্টো ফলেরই সম্ভাবনা।

বললুম, এক হবার ইচ্ছেটা স্বয়ংক্রিয় এবং স্বতঃস্ফূর্ত কি না সামনের উপনির্বাচনে সেইটেই দেখিয়ে দেবো আমরা।

—পারবেনা ভাই। নিশ্চিত জেনো হার হবে তোমাদের। কি জানো, চতুর্ধার থেকে কোনঠাসা হয়ে বাঙালীর আজ যে অবস্থা, অতি নিকট কাউকেও বিশ্বাস করতে ভয় পায় সে। আর ভয়টা যে একেবারে অমূলক নয় তাও স্বীকার করবে আশা করি?···বড় বড় উদাহরণের কথা ছেড়েই দিলাম, একটা ছোট্ট নজির দিই শুধু। গতবারে কল্যাণী কংগ্রেসের কথাটাই ধরোনা কেন! অধিবেশন বসেছে বাঙলায়, বাঙালী প্রতিনিধিরা বাংলাতেই ভাষণ দেবেন এই তো স্বাভাবিক, অথচ আপত্তির ঝড় উঠলো, বাংলা চলবেনা হিন্দিতে বলতে হবে। শেষে নেহরুর ধমক খেয়ে হিন্দী প্রেমিকরা চুপ। নেহরুর সর্বগ্রাসী ব্যক্তিত্ব আজ বহু আভ্যন্তরীণ গলদেরই মুখ বন্ধ করে রেখেছে, কিন্তু এর পরে?

যুক্তি আছে অনীশের কথায়, মানি। সত্যি বলতে কি, বাংলা-বিহার এক হোক বলে যতই না গলাবাজি করি, নিজেও মনে মনে সুরটা মেলাতে পারিনা ঠিক। কিন্তু উপায় নেই, কংগ্রেসের জন্যে কিছু খাটা-খাটুনি দেখাতেই হবে। ওই ব্যাটা সাধুখাঁ ক-অক্ষর কিনা গোমাংস যার কাছে, কবে সেই বিয়াল্লিশে এক হপ্তা হাজতে ছিল, সেই দৌলত ভাঙিয়ে পটাপট লাইসেন্স বের করছে! রাজ্যপাল ভবনে জলসায় নেমন্তন্ন পাচ্ছে, খবরের কাগজে কোণের দিকে নামও উঠছে মাঝে মাঝে আর আমি এখানে পোস্তায় গরমে ভন ভন মাছি তাড়াচ্ছি সারাদিন। বাবা-জ্যেঠা মিলে কারবারটা ফেঁদেছিলেন ভালই। মা-লক্ষ্মী কৃপা করেন মন্দ না, শুধু নামটাতে কোন জৌলুশ নেই। আলু কথাটা শুনতেই কানে যেন খট করে লাগে। ডেলহৌসি

স্কোয়ারে ক্লিয়ারিং এজেন্সির অফিসটা খুলে তবু মুখ রক্ষা করলুম কিছুটা।

সে মুখও তো পুড়ে চুণ হয়ে গেল আজ।

অল্প-স্বল্প হাত দেখতে জানে স্টক ব্রোকার ত্রিবেদী, বলেছিল ঠিক।—সময়টা খারাপ আসছে চৌধুরী, সাবধানে থাকো কটা মাস।

মজুমদার সেই সবে ফিরেছে রেঙ্গুন থেকে। কাজ-কারবার গতবারের দ্বিগুণ, টাকায়-নোটে ঝলমল করছি। হেসেই উড়িয়ে দিলুম কথাটা। বললুম, শেয়ার মার্কেট ভাল্ যাচ্ছে দেখে হীরে-মুক্তোর দালালিতে লেগে পড়লে না কি? তা তোমার অসাধ্য কিছুই নেই!

বাঁশরীর বাবা তখন বসে অফিসে। এসেছিলেন রাইটার্স বিল্ডিং-এর শিক্ষা-দপ্তরে কি কাজের দরখাস্ত পেশ করতে। মেয়ের অফিসটা দেখে গেলেন। লোক সুবিধের নয়, বেশ একটু রগচটা গোছের। বসেছিলেন এক কোণে চেয়ারে, কথাগুলো ত্রিবেদীর কানে যায়নি নিশ্চয়ই শুধু হাত নিয়ে নাড়াচাড়াটা লক্ষ্য করছিলেন।

হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, মহাশয় তো দেখছি হাত দেখে ভবিষ্যৎ গণনা করছেন, একটা প্রশ্ন করতে পারি কি?

—বলুন, ত্রিবেদী উৎসুক হয়ে চোখ তুললেন।

—এই যে আমাকে দেখছেন, আমি একজন উদ্বাস্তু। সরকার যাদের রিফিউজি আখ্যা দিয়েছেন। একা নই, আমার মতো লক্ষ লক্ষ লোক এইভাবে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে পূর্ব পুরুষের বাস্তু ছেড়ে। আপনি কি বলতে চান রাশি-নক্ষত্র-লগ্ন নির্বিশেষে এতগুলো শিশু-জোয়ান-বুড়োর হাতে একই ভাগ্যের লিখন, যে উনিশশো সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্ট একজোটে দল বেঁধে নিজ-ভূমে-পরবাসী হবো সকলে?···যত সব

প্রশ্নের আকস্মিকতায় এবং মন্তব্যের অভব্যতায় বিব্রত হয়ে ত্রিবেদী আমার মুখের দিকে তাকালে। আমি বিরক্ত হয়ে বাঁশরীর টেবিলের দিকে চাইলুম, লজ্জা পেয়ে বাঁশরী টাইপ-রাইটারে মুখ নামালে কিন্তু হ্যাঁ, কথাটার ঠিক জবাব জোগালো না কারুর মুখে ?

আরও একটা কথা চুপি চুপি বলেছিল ত্রিবেদী। আমি নাকি খুব শীগগির প্রেমে পড়তে যাচ্ছি একটি মেয়ের। ভবিষ্যৎ বাণীর দ্বিতীয় অংশটা যে অত তাড়াতাড়ি ফলে যেতে পারে ও নিজেও বোধ হয় ভাবেনি তা !

সেই দিনই। ঘণ্টাখানেক পরে। ইন্‌কাম ট্যাক্সের অফিস থেকে হিসেব দাখিলের তারিখ দিয়েছে। এ্যাকাউণ্টস বুকখানা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে চোখ বুলোচ্ছি, দরজা ঠেলে ঢুকলো বাঁশরী।

শুনলুম কিছু টাকার দরকার ওর, মাইনের অন্তত অর্ধেকটা এ-মাসে আগাম পেলে সুবিধে হয়। বুঝতে পারলুম ঐ জন্যেই পিতৃদেবের আগমন ঘটেছিল অসময়ে।

টাকা কাছেই ছিল। বললুম, নায়ারকে জানিয়ে দেবেন।

কৃতজ্ঞ চোখে ঘাড় নেড়ে স্বীকৃতি জানালো বাঁশরী।

অর্ধনমিত সেই দুটি চোখের দিকে চেয়ে ইনকম-ট্যাক্সের হিসেব-পত্তর হঠাৎ যেন গুলিয়ে গেল আমার। পড়ন্ত বিকেলের এক ফালি রোদ জানলার ফ্রেমের মাপে আয়ত এঁকেছে। পূবের দেয়ালে সেই ঝিকিমিকি আল্পনার দিকে চেয়ে খেয়াল হলো দিনের পর দিন কাজ করে চলেছি এই অন্ধ ঘরে, কই জানি নি তো এখানেও সময় হলে আলো পড়ে, এমনি অবাক করে।

বাড়ি ফেরার পরেও কথাটা মনের মধ্যে জড়িয়ে রইল সারাক্ষণ।

অথচ বাঁশরী কাজ করছে আমার অফিসে ত্ন-মাসেরও কিছু বেশি। কখনোই কিন্তু হয়নি এমন ধারা।

পরের দিন সকালে মন স্থির করলুম। ছুটির একটু আগে ডেকে পাঠালুম বাঁশরীকে আমার ঘরে। একথা সেকথার পরে শুধোলুম, মুস্কিলে পড়ে গিয়েছি একটু, আসান করবেন ?

বিস্ময়ের চোখে তাকালো ও।

বললুম, এক বন্ধুর বিয়েতে একখানা ভাল শাড়ি উপহার দিতে চাই। মেয়েদের জিনিস মেয়েরাই বোঝে ভাল। নির্বাচনে একটু সাহায্য করবেন আমাকে ? ঘণ্টাখানেক হয়তো লাগবে, রাস্তা তো ত্নজনের একই, সেদিনের মতো পৌঁছে দেবো আপনাকে।

কি যেন একটু ভাবলো বাঁশরী। বললে, চলুন।

শাড়ি নিলুম মোট তিনখানা। শীতাংশুর বৌ-এর খানা বাদ দিয়েও আরো ত্নখানা। একখানা আরতির, অন্যখানা পছন্দ করলুম আমি নিজে, বাঁশরীর জন্যে। যদিও সেকথা জানালুম না ওকে তখন।

দোকান থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, চা খাবেন নাকি ?

ঘাড় নেড়ে না করলে ও। ফিরতে দেরি হয়ে যাবে, বাড়িতে দেখে এসেছে বাবার শরীর অসুস্থ।

গাড়িতে উঠলুম ত্নজনে। যখন শুনলে তৃতীয় শাড়িখানা ওরই জন্যে কেনা, সোজা প্রত্যাখ্যান করলে। ভঙ্গিটা এমনিই সংযত আমি অনুরোধ করতে সাহস পেলুম না আর।

খানিক পরে ওদের পাড়ার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছেচি যখন বললে, রাগ করলেন তো আমার ওপর ?

উত্তর দিলুম, না না রাগ কিসের ? এখন বুঝতে পারছি শাড়িটা কিনে যথেষ্ট অন্যায় করেছি আমি, গোড়ায় অতটা ভেবে দেখিনি।

কয়েক সেকেণ্ড পরে আবার বললে ও, মনে করবেন না কিছু! দোষ আমারই। আপনি কত সহজ মনে দিচ্ছেন, অথচ আমি নিতে বাস্তবিকই বিব্রত বোধ করছি।

বললুম, থাকনা ওটা পড়ে, মিছে কেন ভাবছেন ও নিয়ে? হালকা হয়ে বসুন আপনি।

একটু পরে বললে, চা খাবেন বললেন তখন, নামবেন আমাদের বাড়ি? চলুন না, বাবাও রয়েছেন এ সময়, আনন্দ করবেন।

—চলুন।

ওদের গলির ঠিক মুখটিতে দেখি বাস স্টপেজে দাঁড়িয়ে অনীশ আকাশ-পাতাল ভাবছে! বাঁশরীই আগে দেখলে, বললে, ঐ দেখুন অনীশ দা, বোধ হয় আমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিলেন, না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন।

ডেকে নিলুম ওকে। বাঁশরীদের বাড়ি নেমে চা খেলুম তিনজনে! শাড়িখানা নিয়েও শেষ অবধি আর আপত্তি তুললে না ও, প্রসন্ন মনেই নিলে বোধ হলো। অনীশকেও দেখালে প্যাকেটটা খুলে।

না দেখালেই পারতো! জয়ন্তীর কানে গিয়ে তুলেছে কথাটা ঠিক!

পরের দুতিনটে হপ্তা কেটে গেল যেন নেশায় পেয়ে। ভূতের মতো খেটেছি সারাটা দিন। অফিসের কাজে সামান্যই, বেশিটাই উপনির্বাচনের ব্যাপারে। শুনেছিলুম রাজনীতির নেশাটা মনের চেয়ে ঝাঁঝালো, দেখলুম মিথ্যে নয়। গোড়ায় নেমেছিলুম কর্তামহলে জানপহেচানের জন্যে, শেষে কিন্তু রীতিমতোই মেতে গেলুম। মাঝখানে পোস্তার গদিতে পড়ে তলোয়ারে মরচে ধরছিল। কলেজে ডিবেটিং

সোসাইটির পাণ্ডা ছিলুম এককালে। দেশবন্ধু পার্কে উপমন্ত্রী চক্রবর্তী মশাই সেদিন জোর করে দিলেন তুলে, বললেন বক্তৃতা করুন। ঘাবড়ে গিয়েছিলুম খুব, শেষ হলে শুনি আমার ভাষণটাই উৎরে গিয়েছে সব চেয়ে। ঘোরাঘুরির ধকল পুরোনো গাড়িটার সইলনা শেষ অবধি, বদলে এই ল্যাণ্ডমাস্টারখানা নিতে হলো। অফিসের সঙ্গে শেষের দিকে সম্পর্ক দাঁড়ালো কোনদিন আধঘণ্টা—বড় জোর এক ঘণ্টার।

অথচ ভাবলে অবাক লাগে, অফিসের এই সামান্য সময়টুকু যেন অন্য লোক আমি। এখানে তিন তলার এই ছোট্ট পার্টিশন-ঘেরা ঘরে রাজনীতি নিয়ে কেচ্ছা নেই, বাংলা-বিহার মন-কষাকষি নেই। এখানে শুধু শ্যামলী এক মেয়ের ঢলোঢলো দুকূল ছাওয়া চোখের টলোটলো মাধুরীর অচ্ছোদ সরোবর। হোথায় আমায় ডুবতে দাও, ওগো মরতে দাও!

মজুমদারের সঙ্গে জরুরি পরামর্শ ছিল, সেদিন গিয়েছি একটু আগেই। শুনি গিয়েছে ও কাস্টমস্ অফিসে, ফিরতে তখনো দেরি।

বাঁশরী এলো এক তাড়া চিঠিপত্র সই করাতে। বললে, আপনাকে ভারী ক্লান্ত দেখাচ্ছে যে?

—খুব?

—ভীষণ! যেন রাত জেগে ট্রেন জার্নি করে এলেন এই মাত্র!

ভাবলুম বলি, পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ, আসিতে তোমার দ্বারে। বললে নিশ্চয় কিছু মনে করতো না বাঁশরী, মুখ নামিয়ে লাজুক একটু হাসতো শুধু। এই ক'হপ্তায় গাম্ভীর্যের তুষার স্তূপ অনেকটা গলিয়ে এনেছি কিনা! মহারাষ্ট্র-নিবাস হলে শুভলক্ষ্মীর গান ছিল কদিন আগে, নিয়ে গিয়েছিলুম সঙ্গে করে, খুব খুশি। একদিন বিকেলে ওর নিজের গানও শোনালে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলের

সামনে লনে বসে। রবীন্দ্র সঙ্গীত। 'আধেক ঘুমে নয়ন চুমে স্বপন দিয়ে যায়।···বনের ছায়া মনের সাথি, বাসনা নাহি কিছু—পথের ধারে আসন পাতি না চাহি ফিরে পিছু,'···বেশ লাইন কটি। গত শনিবার গিয়েছিলুম হেলেন অব ট্রয় দেখতে। টিকিট কেনা ছিল তিনখানা, মজুমদার শেষ অবধি গেল না। লক্ষ্য করেছি কেমন যেন এড়িয়ে চলতে চায় ও বাঁশরীকে। বুঝি না কারণ কি!

—চুপ করে রইলেন? কি ভাবছেন? বাঁশরী শুধোলে।

—কিছু না। কোথায় গিয়েছিলুম জিজ্ঞেস করছিলে না? সকাল বেলাই গাড়ি নিয়ে যেতে হয়েছিল বর্ধমান। ওখানকার আড়ৎদার ভৃগুরাম অনেকগুলো টাকা বাকী ফেলেছে। দিলে কিছু তবে সামান্যই, বাকীটা দেবে মাসখানেক পরে। মাঝখান থেকে এক শিশি আতর গছিয়ে দিলে।

—টাকার বদলে আতর?

—উঁহু, বদল-টদল নয়, উপহার দিলে। ওর ভাই ঢাকা থেকে আনিয়েছে।···নেবে তুমি?

—আমি? সচকিত বিস্ময়ে বললে, আমি আতর নিয়ে করবো কি?

—গন্ধটি কিন্তু অপূর্ব! ছোট্ট শিশিটা বের করে টেবিলে রাখলুম। বললুম, দেখো, রাত্রে মাথার বালিশে একটি ফোঁটা ঢেলে, গন্ধে ঘুম আসবে না।

লঘু কণ্ঠে হেসে উঠলো বাঁশরী। বললে, সর্বনাশ! ঘুমের যে বড় দরকার আমার। ভোরে উঠি, রান্না থেকে শুরু করে ঘরের সব কাজ একলা হাতে করতে হয়। দুপুরটা অফিসে। সন্ধ্যেয় ফিরে আবার যথাপূর্বং! তারই মধ্যে দুদিন গান শিখতে যাই, দুদিন যাই শেখাতে।

রাত্রে শুই, তাও বাবার জন্যে বার দুয়েক অন্তত উঠতে হয় রোজই। আতরের গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে কড়িকাঠ গুনলে কি আমার চলে!

—তবে যে সেদিন বললে কবিরাজি ওষুধে বাবার উপকার হচ্ছে বেশ?

—প্রথম কদিন তো সেই রকমই মনে হয়েছিল, এখন দেখছি সাময়িক একটু আরাম দেয়, এইমাত্র।

পার্টিশনের আড়ালে মজুমদারের গলা পেলুম, কি বোঝাচ্ছে নায়ারকে।

উঠে পড়লো বাঁশরী।

—আতরটা নিলে না তাহলে?

—কি যে বলেন! দেড়খানা ঘরে যারা সংসার পেতে থাকে, আতরের গন্ধ লাগতে নেই তাদের বালিশে। নিন্দে রটে।

তারপর এই আজ। সকাল থেকেই চরম উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে, উৎকণ্ঠাও কম ছিল না কিছু। তিনটে নাগাদ খবর পাওয়া গেল আমরা হারছি। সন্ধ্যের আগেই গণনা শেষ, বহু ভোটের ব্যবধানে হেরেছে কংগ্রেস উত্তর কলকাতার উপনির্বাচনে।

মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল কি? না তা নয়! বরং একটু পরে বিশেষ সংস্করণ কাগজগুলোয় চোখ বুলোতে বুলোতে মনে হল, এই ভাল হয়েছে। সারা পশ্চিম বাংলার হয়ে উত্তর কলকাতা আজ মুখের মতো জবাব দিয়েছে।

পকেটে একখানা চ্যারিটি শোয়ের টিকিট ছিল। গছিয়েছিল ফিল্মের অরুণ লাহিড়ী। নিজে হাতে করে গড়েছে এই নতুন দলটা, নাম

দিয়েছে আকাশ-প্রদীপ ; বাসনা এখান থেকে ট্যালেণ্টেড আর্টিস্ট বেছে নিয়ে স্টার বানাবে রাতারাতি।

নিউ এম্পায়ারে পৌছলুম, সাড়ে ছটা বেজে গিয়েছে। অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়ে গিয়েছে আধ ঘণ্টার ওপর, শুনলুম তৃতীয় দৃশ্য চলছে। ভেতরে গিয়ে যথাস্থানে বসলুম।

চতুর্থ দৃশ্যের মাঝামাঝি বিস্ময়ে দুচোখ রগড়ালুম। দেখি স্টেজে ঢুকলো বাঁশরী, গান গাইতে গাইতে। অডিটোরিয়ামের স্বচ্ছ অন্ধকারে প্রোগ্রামখানা খুলে তাড়াতাড়ি উল্টে-পাল্টে দেখলুম, কুমারী বাঁশরী রায়ের নাম রয়েছে বটে। কই, আমাকে তো ঘুনাক্ষরেও বলেনি কিছু!

স্টেজের ওপরে হলদে-সবুজ আলোয় রচিত হয়েছে ফাল্গুন রজনীর পটভূমিকা। বনদেবীরা আবাহন জানাচ্ছেন ঋতুরাজকে, কেউ নৃত্যে, কেউ গানে। বাঁশরী রয়েছে গানের দলে। বাহারের সুর ভাঙা হালকা চালের একটি গান পরিবেশিত হচ্ছে তারই তালে তালে। একটি একটি করে পুষ্পতরু মুঞ্জরিত হয়ে চলেছে এ কোণে ও কোণে। আমার বুকের অলক্ষ্য কাঁটাগুলো কিন্তু বিঁধেই চলেছে সর্বক্ষণ। নিমন্ত্রণ বাড়িতে অনাহুত এসে পাত পেড়ে বসেছি যেন। বাঁশরীতো এ-সবের কিছুই বলেনি আমায়?

পালা শেষ হলো সাড়ে আটটায়। ভেতরে গিয়ে দেখা করা যেতো, কিন্তু ভাবলুম সামনের দিক দিয়েই তো বেরুবে ওরা। এক গ্লাস লিমন স্কোয়াশ নিয়ে বাইরে এসে বসলুম। মিনিট কয়েক পরেই বাইরে এলো বাঁশরী, পাশে অরুণ লাহিড়ী। কি যেন বললে লাহিড়ী ওর কানের কাছে। মাঝখানের করিডর পার হয়ে চলে গেল দুজনে লাইট হাউসের দিকে, সম্ভবত ব্রেসারিতে বসবে ওরা। পিছু পিছু দলের

আরও অনেকেই বাইরে এসেছিল। তারা বসলো আমারই এপাশে ওপাশে বেশ ক'খানা টেবিল পর পর দখল করে।

বুঝলুম দেখতে পায়নি বাঁশরী আমায়। গ্লাসটি শেষ করলুম ধীরে সুস্থে। পাশে ওরা সকলে আজকের অভিনয় নিয়েই চুটকি আলোচনা করছে। কে কোথায় ভুল করেছে, নার্ভাস হয়ে পরের কথা আগে বেরিয়ে গিয়েছে কার, কে প্রম্পটিং শুনতে পায়নি একটি বর্ণও অথচ নিজের বুদ্ধিতে ম্যানেজ করে নিয়েছে সব কিছু ইত্যাদি ইত্যাদি। ওয়েটারকে ডেকে বিল চুকিয়ে করিডরের দিকে এগোলুম, অভিনন্দন জানাবো বাঁশরীকে; লাহিড়ীকেও কনগ্রাচুলেট করবো ওর নতুন প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্যে। যদিও লোকটার সঙ্গে কথা কইতেই ইচ্ছে করে না আদপে। ব্রিস্টলে একটা শুক্রবার তিনশো টাকা ধার নিলে, বললে, সোমবার অতি অবশ্য ফেরৎ দেবে। চার মাসে ষোলটা সোমবার এলো গেলো উচ্চবাচ্চই নেই আর।

নাইট-শো আরম্ভ হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। ব্রেসারি তাই একেবারে নির্জন। এ ধারের টেবিলে ক'টি পাঞ্জাবি ছেলে-মেয়ে গল্পগুজব করছে। ওদিকের শেষ কোণে অর্কেস্ট্রার ঠিক তলায় বাঁশরী বসে লাহিড়ীর সঙ্গে।

আমায় দেখতে পেয়ে খুব খুশি বাঁশরী। প্রায় সোরগোল তুলে ফেললে। বললে, আপনি এসময়ে? সিনেমা দেখতে বুঝি?

বললুম, না রাতের শো তো কখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে! আমি এসেছি বহুক্ষণ আগে। তোমাদের বসন্ত-উৎসব দেখলুম।

—সত্যি? না কি বানিয়ে বলছেন?

—উঁহু! এই তো লাহিড়ী সাহেবকেই জিজ্ঞেস করো না, যাঁর নিমন্ত্রণে এসেছিলুম।

লাহিড়ী বললে, বসুন মিস্টার চৌধুরী। কেমন লাগলো আমার অনুষ্ঠান বলুন!

হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললুম, চমৎকার হয়েছে আপনার প্রোডাকশন, আশাতীত রকমের ভাল!

মনে হলো লাহিড়ী ঠিক খুশি নয় আমার আগমনে। গম্ভীর গলায় বললে, মিস রয়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় রয়েছে দেখছি।

বললুম, খুব সামান্য। তারপর ওঁকে একেবারে উপেক্ষা করে বাঁশরীকে শুধোলুম, বাড়ি ফিরবে তো এখন? না কি দেরি হবে?

ওর হয়ে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে লাহিড়ী, আমার সঙ্গে সে বিষয়ে কথা ওঁর হয়েই আছে। জরুরি দুএকটা আলোচনা বাকী রয়েছে, তারপরে আমার গাড়িতেই পৌঁছে দেবো, মিস রয়কে।

হেসে বললুম, তাহলে তো ভালই, তবে কিনা আপনি থাকেন টালিগঞ্জে আর ও একেবারে অন্য সীমান্তের লোক।

বাঁশরী উঠে পড়লো। বললে, আজ থাক, পরে আপনার সঙ্গে কথা কইবো অরুণবাবু। মাথাটা ভীষণ ধরে রয়েছে, ভাল লাগছে না কিছু, সমীরবাবুর গাড়িতেই আসছি আমি। কেন আর মিথ্যে কষ্ট দেবো আপনাকে!

—বেশ! যেমন আপনার অভিরুচি। তবে কষ্টের কথা ওঠেই না এর মধ্যে।

ঘুঘু লাহিড়ী দেখলুম চটেছে খুব।

নিচে এসে গাড়িতে স্টার্ট দিলুম।

অবাক হয়ে বাঁশরী বললে, এদিকে?

গম্ভীর গলায় জবাব দিলুম ক্ষিধে পেয়েছে, কিছু খাবো আগে। সেই

সকালে বেরিয়েছি বাড়ি থেকে, সারাদিনে পেটে গিয়েছে শুধু বার দশেক চা আর পুরো একটি টিন সিগ্রেটের ধোঁয়া।

গুন গুন আপত্তি তুললে, দেরি হয়ে যাচ্ছে, বাড়িতে বাবার জ্বর।

ততক্ষণে গাড়ি আমার গ্রেট ইস্টার্নের সামনে এসে থেমেছে আর পাকানো গোঁফ মুচড়ে শিখ দারোয়ান সেলাম ঠুকে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে।

বললুম, চলো নামো, ঠিক পনের মিনিট লাগবে আমার। দেখবে, গোগ্রাসে গিলবো।

ভেতরে ঢুকলুম এবং ওপরে উঠলুম।

প্রায় তিল ধারণের স্থান নেই। ওরই মধ্যে এক পাশে দুজনের জায়গা খুঁজে দিলে ওদের রিসেপসনিস্ট। ইরাণ থেকে দুটি তরুণী নর্তকী আনিয়েছেন এঁরা। আজকের মুখ্য আকর্ষণ তাঁরাই। তবে এখনো ঘণ্টাখানেক দেরি তাঁদের আবির্ভাবের, ইতিমধ্যে হোটেলের নিজস্ব অর্কেস্ট্রা মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করছে অতিথিদের।

খেতে খেতে বাঁশরীকে বললুম, বেশ বাজাচ্ছে, নয় ?

একটু চুপ করে থেকে ও উত্তর করলে, কি জানি আমার যেন কেমন বেসুরো লাগছে। মনে হচ্ছে ঠিক সার্কাসের বাজনা শুনছি।

—অর্থাৎ যদিও তুমি নিজে শিল্পী একজন, আসলে তোমার কানই তৈরি হয়নি এখনো। যেটাকে বেসুর ভাবছো, ওরই নাম হার্মনি—বাংলায় বলা চলতে পারে সুর-সঙ্গতি। এর পাশে আমাদের দেশী বাজনা নেহাৎই জোলো, পানশে কি বলো ?

মৃদু হেসে বললে, দরকার নেই আমার ঐ জগঝম্প শোনার জন্যে কান তৈরি করে, ওর চেয়ে আমাদের মেলডিই ভাল।…নিন্, তাড়াতাড়ি করুন আপনি।

অগত্যা নীরবে আহার্যে মন দিলুম। কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে রয়েছে বাঁশরী আজ, ছটফট করছে সর্বক্ষণ, অস্থির চোখে তাকাচ্ছে এদিকে ওদিকে। খেলেও নাম মাত্র। সামান্য!

সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু খুবই। এত মিষ্টি বুঝি আগে কোনদিন লাগেনি। পরনে চম্পা-রঙের সিল্কের শাড়িখানি, খয়েরি রঙের পাড়, তাতে জরির কাজ করা। অভিনয়ের জন্যে যে অঙ্গরাগ করেছিল সন্ধ্যায়, মুছে ফেলার আর অবসর পায়নি, এখনো তা সম্পূর্ণ অম্লান। ভ্রূ-সঙ্গমে কুঙ্কুমের টিপটি, কপালে-গালে চন্দনের ফোঁটাগুলি। অফিসে দেখি রোজ শাদা-মাঠা মিলের শাড়ি পরনে, চুলগুলো এলো খোঁপায় জড়ানো, পায়ে চপ্পল না হয় স্যাণ্ডেল। আজকের এই রাজেন্দ্রাণীর দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলুম তাই, কোন রূপটি ওর আসল। মনে হলো দুটোরই প্রয়োজন রয়েছে, একটি সর্বক্ষণের; অন্যটি বিশেষ মুহূর্তের, যেমন এই আজকের।

বাইরে এসে গাড়িতে বসে অনেকক্ষণ পরে মুখ খুললে বাঁশরী। বললে, আমার অভিনয় কেমন দেখলেন বললেন না তো কিছু?

—এক কথায় সবটা বলতে গেলে অপূর্ব!

—ওতো অতিশয়োক্তি আপনার। অন্য কেউ বললে ভাবতুম ব্যঙ্গোক্তি।

—সত্যি কথা শুনবে?

—এতক্ষণ শুধু মিথ্যেই শুনতে চাইছি বুঝি?

—অভিনয় সম্বন্ধে কিছু বলবোনা আমি, তুমি তো নিমন্ত্রণ করোনি আমাকে!

—রাগ করেছেন বুঝি সেইজন্তে? আসলে কিন্তু আমার সাহসই হয়নি আপনাকে জানাতে, হয়তো পছন্দ করবেন না তাই। ছোট সায়েব একদিন এই থিয়েটারের ব্যাপার নিয়ে খুব দুচার লাইন উপদেশ শুনিয়ে দিয়েছিলেন কি না! রীতিমতো ধমকের সুরে।

—ধমক দিয়েছিল মজুমদার? তোমাকে?

—তাছাড়া আর কি বলা যায় তাকে। যাক সে কথা, এখন বলুন আপনি কেমন লাগলো আমাদের বসন্ত-উৎসব। অন্তত আমার অংশটা সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে বলুন কিছু।

—নিরপেক্ষতা যে শুনেছি মেয়েরা দুচোখে দেখতে পারে না? তারা হয় এ চোখে দেখবে, নয় ও চোখে। আসলে তোমরা মেয়েরা মাত্রেই এক-চোখো!

—বাজে কথা রাখুন, বাড়ি এসে পড়লো বলে।

—ধৈর্য ধরছে না বুঝি? শোনো তবে। সব মিলিয়ে অনুষ্ঠান তোমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। আর তোমার সম্বন্ধে রায় হলো গানগুলো মধুবর্ষণ করেছে, অভিনয় মোটেই উৎরোয়নি। কিছু মনে করলেনা আশা করি।

—আহা, মনে করার কি আছে এতে? অরুণ লাহিড়ীও তো ওই কথাই বলছিলেন। তা প্রথম স্টেজে নেমে এর বেশি আর কি পারবো বলুন?

—সে অবশ্যই ঠিক কথা।

—আপনাকে দেখে আমার তখন কতখানি আনন্দ হয়েছিল জানেন? মনে মনে ঠিক আপনাকেই বোধ হয় খুঁজেছিলুম সেই

বুঝেছিলুম তা। লাইট হাউস ব্রেসারিতে হঠাৎ আমাকে দেখে ওর সেই অকৃত্রিম আনন্দের অভিব্যক্তি দৃষ্টি এড়ায়নি আমার।···তবে কি সময় হলো এতদিনে?···মন পাখি, পাখা মেলো পাখা মেলো দিগন্ত যে রঙে রঙে লালে লাল হলো!

—কি হলো, চুপ করে গেলেন যে?

—ভাবছি!

—কি?

—একটা কথা।

—শুনতে পাইনা?

—সত্যি! শুনবে তুমি?

হ্যারিসন রোডের মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ লাল আলোর সিগন্যালে গাড়ি আটকেছে। পাঁচ সেকেণ্ড···দশ সেকেণ্ড···আধ মিনিট। হাত-খানা বাঁশরীর আমার ঠিক পাশেই। মায়ের দেওয়া কমল-হীরের যে আংটিটা ব্যবহার করি সর্বক্ষণ আমার কনিষ্ঠায়, খুলে নিয়ে পরিয়ে দিলুম ওর মধ্যমায়।

চমকে উঠে সিধে হয়ে বসলো বাঁশরী, কেমন যেন শক্ত হয়ে গেল হাতখানা ওর।

মেয়েটা সত্যিই ভীতু ভারী ঘাবড়ে গিয়েছে। বুঝি এ অযাচিত ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে পারছে না এখনো!

কারও মুখে কথা নেই আর। ওদের গলির মুখে পৌছোতে শুধু বললে মৃদুস্বরে, গাড়িটা এখানেই রাখুন।

—সে কি? ভেতর পর্যন্ত যাবোনা?

বললে, আজ আর নয়।

বুঝলুম লজ্জা পাচ্ছে।

তারপর গাড়ি চালিয়ে সোজা বাড়ি ফিরলুম। গ্যারেজে গাড়ি তুলে নামতে যাচ্ছি, দেখি পাশের কুশনে কি যেন চকচক করছে।

হেঁট হয়ে তুলে নিলুম।

আমার দেওয়া আংটিটা।

অস্বীকার করেছে বাঁশরী।

ছয়

বাঁশরীর কথা

অরুণ লাহিড়ীর প্রস্তাবের আভাস দিয়েছিল মুকাদি অনেক আগেই। সমীরবাবুর বিষয়ে ইঙ্গিতটাও সেই দিনই করেছিল ও। অতটা তলিয়ে বুঝিনি তখন, তাই এ নিয়ে আর ভাবিনি পরে। কিংবা কে বলবে হয়তো সব কিছুই বুঝেছিলুম নিজের অগোচরে, সুগোপন ভাবনাও ছিল নিশ্চয় মনে মনে। নইলে প্রয়োজনের সময়ে অত দ্রুত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারলুম কি করে?

সেদিন কিন্তু হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলুম কথাগুলো মুকাদির। দেখা হয়েছিল রেডিও অফিসে। সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে, খানিক আগে প্রোগ্রাম সেরে বসে আছি, দেখি বেরুচ্ছে ও।

থমকে দাঁড়ালো আমায় দেখে।

বললুম, মুকাদি তুমি এখানে?

—রিহার্সাল ছিল আমার। আটাশ তারিখের নাটকে ভূমিকা দিয়েছে একটা। একটু আগেই তো গান শুনছিলুম তোর। কোথা যাবি এখন, বাড়ি?

বললুম, কি করে যাই, ঘণ্টা দেড়েক পরে আবার একবার গান রয়েছে যে!

—ঢের দেরি তার। অতক্ষণ এখানে বসে বসে কান ঝালাপালা করবি নাকি? চল্ আমার সঙ্গে, ভয় নেই ঠিক সময়ে পৌঁছে যাবি আবার।

বাইরে এসে শুধোলুম ব্যাপার কি বল দেখি তোমার ? মাসখানেক হতে চললো পাত্তাই নেই একেবারে, উবে গিয়েছিলে নাকি ?

—থামা দে, যথেষ্ট হয়েছে। মুখেই সুকাদি সুকাদি, খোঁজ নিয়েছিলি একবার সুকাদি রইল না পটল তুললো ?

—ও মা, এখন বুঝি সব দোষ আমার ? মাঝে চিঠি দিলুম একখানা, জবাবই এলোনা তার। ভাবছিলুম যাই একদিন তোমার ওখানে। ক্লাবেও দেখি আসছো না আর।

—আর গিয়ে কাজ নেই তোর, থাক্ !

—বেশ।

—ব্যস, রাগ হয়ে গেল মেয়ের ? ওখানে আর আছি নাকি এখন আমি ? এই কাছেই চমৎকার ফ্ল্যাট পেয়ে গেছি একখানা। একেবারে আনকোরা নতুন বাড়ি। দক্ষিণ খোলা দুখানা ঘর, সামনের বারান্দায় দাঁড়ালে নিচে আশি ফুট চওড়া রাস্তা ঝকঝক করছে। গিয়েই দেখবি চল্‌না, উঠে এসেছি এই পয়লা থেকে। তার আগে দিন দশেক অবশ্য বাইরে ছিলুম। গিরিডি নিয়ে গিয়েছিল 'ধূসর পাহাড়' ছবির আউটডোর স্যুটিংএ।

—তাই বুঝি খোঁজ খবর পাইনি কিছু ? কিন্তু এদিকে চলে এলে, ভাড়া যে আকাশ-ছোঁয়া শুনি।

কপালের চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে তাচ্ছিল্যের স্বরে জবাব দিলে সুকাদি। হলেই বা, রোজগার করছি না ? জানিস একসঙ্গে ছ-খানা ছবিতে কাজ করছি এখন ? পাটগুলো যদিও বড় নয়, তা সে যাই হোক। টেলিফোনের কাজ ছেড়েছি মোটে এই এক বছর, আর কটা মাস যাক না, তনুকা সেন এক হাত করে দেখে নেবেন সব্বাইকে।

—দেখে আবার কাকে নেবে গো ?

—ঐ তো বললুম, সবাইকে। তোকে না তাবলে, উল্টে তুইই কত দেখিয়ে ছাড়বি, শেষে একদিন চিনতেই পারবিনা আর।

অবাক হয়ে বললুম, মানে ?

—শুনিস নি কিছু ?

—শুনবো আবার কি ?

বিস্ময়ের চোখে মুখখানা নিরীক্ষণ করে সুকাদি বললে, লাহিড়ী বলেনি ?

—লাহিড়ী ?

—আকাশ থেকে পড়লি যে ? আমাদের অরুণ লাহিড়ীর কথা বলছি, কি চোখে যে দেখেছে তোকে ? ওর পরের ছবির তুইই তো নায়িকা, সিলেক্টেও হয়ে আছিস।

—ছবিতে নামবো আমি ? একেবারে নায়িকা হয়ে ?

—নইলে আর কি বলছি এতক্ষণ। ক্লাবে যে সেদিন অত ঘটা করে ফটো তোলাতুলি হলো তার আসল পাত্রী তো তুই-ই। রোগা চিমসে মতো যে লোকটা ছবি নিচ্ছিল, জানিস কে ? সুধীন রায়, টলিউডের ফিল্ম লাইনে পয়লা সারির ক্যামেরামান। অবশ্য থাকবে না বেশিদিন, বোম্বাই থেকে টান পড়েছে। শুনলুম তোর নাকি ক্যামেরা ফেস নিখুঁত একেবারে।

চুপ করে শুনে যাওয়াই ভাল বোধ হলো।

হতাশার ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে সুকাদি যোগ করলে, আমাদের আর কিছু হলো না, চেহারাটাই যে মেরে রেখেছে একেবারে! এই সেদিন অবধি একটার বেশি তরকারি জোটেনি ভাতের সঙ্গে তবু যে কোথা থেকে এত মেদ এলো শরীরে! নিদেন মুখখানাও যদি তোর

মতো কাটারি গোছের হতো! ভাবছি বই দেখে দেখে যোগাসন শুরু করে দিই।

—মুখখানা কিন্তু তোমার সত্যিই সুন্দর সুকাদি, আমার তো ভারী মিষ্টি লাগে। যথাসাধ্য গম্ভীর গলায় উত্তর করলুম আমি।

—তোর লাগলে তো বয়েই গেল আমার। তবু যদি বাঁশরী না হয়ে বাঁশুরে হতিস! গালটা টিপে দিয়ে হেসে ফেললে সুকাদি।

ফ্ল্যাটটি ওর সত্যিই চমৎকার। সাজিয়েছেও পরিপাটি করে, যেখানে যেটি মানায়। নেপালি চাকর জুটিয়েছে একটা। দেখতে বাচ্চা, কাজেকর্মে বললে চটপটে খুব। রান্নার ভারও শুনলুম তারই হাতে, চা করে খাওয়ালে, মন্দ নয়।

—একটা কথা বলছি ভাই সুকাদি। দেখো, তুমি আবার দপ করে চটে উঠোনা যেন!

—দিন রাত শুধু রাগতেই দেখিস আমাকে! বল্ কি বলবি।

—ছবিতে আমি কিছুতেই নামতে পারবোনা ভাই। অরুণ লাহিড়ীকে বুঝিয়ে বোলো তুমি। আগে বলেছিলে ওঁর হাতে ক্ষমতা খুব, প্লে ব্যাকে গান গাইবার চান্স করে দেবেন, সেই শুনেই না ভর্তি হলুম আকাশ-প্রদীপের দলে? এতেই কত বিরক্ত হয়ে রয়েছেন বাবা, ছবির কথা শুনলে একেবারে অনর্থ বাধিয়ে বসবেন।…আমার নিজেরও ভাল লাগেনা ওসব। ভয় করে!

—রেখে দে তোর ভয়! আর ক'টা দিন যাক না, টাকায়-পোষাকে শাড়িতে-গাড়িতে যখন ঝলমল করতে থাকবি সারাক্ষণ, কাগজে দেওয়ালে বাছাই বাছাই ছবি ছাপবে আর সিনেমা কাগজের

এডিটরেরা ইণ্টারভিউএর লোভে ছুটবে পিছু পিছু, দেখবি অজান্তেই অভয়া বনে গিয়েছিস কোন অবাক ভোরে।

বললুম, না ভাই মুকাদি, লক্ষ্মীটি এর মধ্যে টেনো না আমায়। অরুণবাবুকেও বলে দিও, এ নিয়ে যেন অনুরোধ না করেন আর, ক্লাব ছাড়তে হবে তবে আমাকে।

—অত আপত্তিটা কোথায় তোর শুনি ? ছবিতে নামা খারাপ ? কেন আজকাল ভদ্র ছেলেমেয়েরা কাজ করছে না ছবিতে ? আমি নামি নি ?

—দেখলে তো, রেগে গেলে তুমি! আমি কি বলেছি খারাপ ? কি জানো, সব ভালই তো আর সকলের পক্ষে সমান ভাল নয় ?

গুম হয়ে বসে রইল মুকাদি। একটু পরে আমার দিকে ফিরে বললে, আসল কথাটা কি বল্ দেখি ? তুই নাকি প্রেম করে বেড়াচ্ছিস আজকাল, ফন্দি খুঁজছিস ঘর বাঁধবি বলে ?

—ঘর বাঁধার ইচ্ছে যে আমাদের মজ্জায় মেশানো মুকাদি, অস্বীকার করি কি বলে। কিন্তু প্রেম করে বেড়াচ্ছি! কি হলো বলো তো তোমার আজ ?

—দেখ্, আমার কাছে ভাঁড়াস না। বাগবাজারের চৌধুরী বাড়ির ঐ নন্দদুলাল চেহারার ছেলেটা, ওর সঙ্গে এত দহরম-মহরম কিসের তোর শুনি ? সেদিন রাত আটটা বাজে, দেখি চৌরঙ্গী-পাড়ায় ঘুর ঘুর করছিস দুজনে। আর একদিনও দেখেছি দুজনকে একসঙ্গে সন্ধ্যের ঠিক পরে নিউ মার্কেটের ফ্লাওয়ার রেঞ্জে।

অবাক গলায় বললুম, সমীর চৌধুরীর কথা বলছো ? উনি হলেন আমার বস্। কাজ করি ওঁর ফার্মে।

—সে তো শুনেছি ডেলহৌসি স্কোয়ারে। না কি সন্ধ্যের পরে চৌরঙ্গীতে ট্যুরিং ব্রাঞ্চ বসছে একটা করে ? দেখ্, পুরুষের চোখের

চাউনি চিনি আমি। বলে রাখলুম, ও ছেলে তোর প্রেমে পড়েছে নির্ঘাত।

আমি লজ্জা পেলুম। এযে একেবারে মিথ্যে। বললুম, কি যে বলো তুমি মুকাদি, মানে হয় না। সিনেমার জগতে ঢুকে ওই এক দোষ হয়েছে তোমার, চতুর্দিকে প্রেম আর ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না।

—থাম্ তুই। আজ থেকে এক মাসের মধ্যে তোর ওই সমীর চৌধুরী প্রপোজ না করে যদি, আমার নাম বদলে রাখিস।

না ভাই মুকাদি, তোমার অমন কাব্যিক নামটা, যা না! কি শুনি কলকাতায় ফাজিল ছেলেদের মুখে মুখে ফিরছে আজকাল। ও বদলাবার কথা আমি ভাবতেই পারি না। তবে দরকারও হবে না তার। বয়ে গেছে সমীর চৌধুরীর আমার কাছে প্রপোজ করতে।

আর, যদি করে?

একটু চুপ করে থেকে জবাব দিলুম, তোমাদের জ্বালায় এবার কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে যাবো আমি।

থতিয়ে গিয়ে মুকাদি বললে, এ আবার কেমনতরো কথা হলো? কেন, তুই কি রাজি নস্ বিয়ে করতে?

—এ নিয়ে ভাবিইনি এখনো!

—ধর্, তোর বাবা যদি পাত্র ঠিক-ঠাক করে এসে বলেন বাঁশী, অমুক দিনে অমুক ক্ষণে তোর বিয়ে—কি করিস?

—গোড়ায় খানিকটা কেঁদে কেটে শেষে হয়তো রাজি হয়ে যাই!

—তবে সমীরের বেলা না করছিস যে?

—আমি যে ভালবাসি না সমীরবাবুকে!

—আর তোর বাবা যে ছেলেকে ধরে আনবেন তাকে বুঝি চোখের দেখার আগেই মন সঁপে বসে আছিস?

—তা কেন ? একটু ভেবে নিয়ে জবাব দিলুম, সেখানে তো আগে থেকে মন দেয়া-নেয়ার কথাই ওঠেনা ! দায়িত্বও তাই অনেক কম। যে নিয়মে বিয়ের প্রথা চলে আসছে আমাদের সমাজে তাতে গোড়ার অংশটা অভিভাবক পক্ষই সমাধা করে দেন কিনা। দুটি দেহ-মনের রুচি আর প্রবৃত্তির মিল সম্পূর্ণ হলে তবেই না কি সার্থক প্রেমের জন্ম সম্ভব হয়, তা দেখো অর্ধেক কাজ এগিয়েই থাকে। মানে, ছেলে-মেয়ের কোষ্ঠী-রাশি-বর্ণ-গণ ইত্যাদি মিলিয়ে যে যোটক বিচার করে দেখা হয়, তারই কথা বলছি আমি। এগুলোর উদ্দেশ্যই তো দু-পক্ষের দৈহিক তথা মানসিক বৃত্তির সমতা পরীক্ষা করে দেখা।

—ওটা একটা বাজে প্রথা। ও-সব আবার সত্যি মেলে না কি !

—যাই হোক, রয়েছে তো প্রথাটা, তাই বলছি। সব কিছু নিশ্চয় যথাযথ মেলে না বা তা সম্ভবও নয়, তবু ধরে নেওয়া যাক খানিকটা এগিয়ে থাকে। বিয়ের পরে পাত্র-পাত্রীর যে মিল তার সূচনা হয় দেহেরই দিক থেকে। দু-চার জন বান্ধবীর বাসরে রাত জাগিনি এমন তো নয়। দেখেছি, সেদিক দিয়েও রাস্তা তৈরি করে রাখেন ঠাকুমা-ঠানদিদিরাই। নইলে কনেকে বরের কোলে বসানো আর বরকে দিয়ে কনের পা ধরানো, এগুলোর অন্য কি অর্থ হয় বলো ?···ফুল-শয্যার রাত বা তার পরের রাতগুলি নিয়ে কতই রোমান্স, কবি-কল্পনার ছড়াছড়ি। অথচ তখনও সব-কিছুই নিছক শরীরটাকেই ঘিরে ! অবশ্য তারপরে একটু একটু করে মধুর রেশ ক্রমে দেহ ছাপিয়ে মনে গিয়ে ছড়ায়। সেতারের সুরের মতো, একটা তারে আওয়াজ তুললেই বাকী তারগুলো আপনা থেকেই ঝঙ্কার দিয়ে বেজে ওঠে।

মুখ টিপে হেসে সুকাদি বললে, খুব পাকা পাকা কথা শিখেছিস দেখি ! ভালবাসার এত রকম-ফের আছে, বিয়ে থেকে প্রেম

আর প্রেম থেকে বিয়ে দুয়ের মধ্যে এতখানি ফারাক, অনেক জ্ঞানই দিলি আজ!

—ঠাট্টা করছো করো, কিন্তু তফাৎ রয়েছে না? বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সেই জন্যেই না বিয়ের আগে ভালবাসার নাম শুনে আঁৎকে ওঠে, বলে ওটা এক ধরণের বায়ু-রোগ। কে জানে, তাই হবে হয়তো। নইলে কি পাবে, কবে পাবে, আদৌ পাবেই কি না, কিছু না বিচার করে এই যে বিনাপণে দাসখৎ লিখে দেওয়া, এ কি সহজ বস্তু না কি? দায়িত্বও তাই অনেক বেশি এখানে। যেখানে ভালবাসাটা উভয় তরফের, সেখানে না-হয় নিষ্পত্তি হয়েই গেল, কিন্তু যেখানে তা নয়? যে দেয় সে এমনিতেই দেয়, না দিয়ে তার পার নেই, কিন্তু যে নেবে তার বুক দুরু দুরু করবেনা? ঐ জন্যেই না বললুম, যদি তোমার বিশ্বাস মতো সমীরবাবু সত্যিই কোনদিন প্রেম নিবেদন করে বসেন আমার কাছে সেইদিনই সব চেয়ে বিপদ আমার। তাকে ভাল না বাসতে পারি, তা বলে ঠকাতেও তো পারিনা! ভালবাসা পাবার চেয়ে ভালবাসা দিয়ে নাকি বেশি সুখ, কিন্তু এ যে দেওয়াও যায়না ইচ্ছে মতো!

—কেন, পাগলামিই যদি বললি, এ তো সুখের পাগলামি। তোর জন্যে এক বেচারি যদি পাগলই হয় তুইও পারবিনা তার জন্যে পাগলিনী সাজতে?

আমি হেসে ফেললুম,—অত হিসেব করে কি প্রেম করা যায়? ইচ্ছে মতো পাগল সাজতে পারো তুমি, তা আমি জানি, কিন্তু সত্যিকারের পাগল হওয়া কি তোমার-আমার হাতে?

—বুঝিনা বাপু তোর আবোল-তাবোল হেঁয়ালি। এতদিন তো জানতুম ভাজা মাছখানাও উল্টে খেতে শিখিস নি আজো!

—বা রে, আবোল-তাবোল বকুনি তো তুমিই শুরু করেছিলে আগে! নির্ভাবনায় থাকো, সমীর চৌধুরীর সঙ্গে সম্পর্ক আমার নিছক প্রভু-ভৃত্যের। একচুল এদিক নয়, ওদিক নয়!

গাড়ির মধ্যে যে মুহূর্তে হাতখানা টেনে নিয়ে সমীরবাবু ওঁর আংটিটা গলিয়ে দিলেন, মুকাদির কথাগুলো পলকের মধ্যে ঝলক দিয়ে গেল মাথার শিরা-উপশিরায়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কর্তব্য স্থির করে দিতে বিলম্ব করেননি।

নামলুম গলির মুখে। গাড়ির পিছনের লাল আলোটা মিলিয়ে গেল একটা স্টেট বাসের আড়ালে। তখনো আমি ফুটপাথে চুপ করে দাঁড়িয়ে। অন্যায় করলুম কি? ভুল হলো কি কোনখানে? না, একান্তভাবে যা করা উচিত ছিল ঠিক তাই করেছি!

আমার দিক থেকে প্রশ্রয় পেয়েছেন এ-কথা সমীরবাবু কিছুতেই বলতে পারবেন না। শুধু একটা দিনের কথা বাদ দিলে, যেদিন ওঁকে গান শোনাই।

তাও শুনিয়েছিলুম, না হলে অভদ্রতা হতো বলে। প্রথম যেদিন আসেন উনি আমাদের বাড়ি সেইদিনই অনুরোধ করেছিলেন। আমি গাইনি, বলেছিলুম অন্যদিন হবে। দ্বিতীয় দিনের অনুরোধ ঠেলতে তাই দ্বিধা হলো। রেডিওতে গাইছি, সিনেমায় প্লে ব্যাকের জন্যে উমেদারি করছি, আমার পক্ষে অতিরিক্ত লজ্জা দেখানোটা বাড়াবাড়ি মনে হতো। স্থান নির্বাচন করলেন সমীরবাবু নিজে।

ফল পেলুম সেই রাত্রেই হাতে হাতে। বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে বাবা ধমক দিয়ে উঠলেন। ব্যাপার কি বল্ দেখি তোর? বাড়ি ফেরার কথা মনেই পড়তে চায় না আর!

অপ্রস্তুত ভাব সামলে নেবার আগেই মিথ্যে কথাটা বেরিয়ে গেল মুখ থেকে, অফিসের কাজে দেরি হয়ে গেল বাবা।

আপাদ-মস্তক চোখ দুটো একবার বুলিয়ে নিলেন বাবা আমার ওপর, বললেন জুতোয় মাটি-কাদা লাগলো কোত্থেকে শুনি? এদিকে তো কই একটি ফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি?

আমি চুপ।

উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। লাঠির ডগা দিয়ে উল্টে দিলেন জুতো জোড়া। গোড়ালির কাছে লেগে রয়েছে ছেঁড়া দু-চারটে ঘাসের কুচি।—আজকাল মিথ্যেও বলছিস তাহলে!—হন হন করে বেরিয়ে গেলেন বাবা বাড়ি থেকে।

তারপর দিন-পাঁচেক কথাই বলেননি আমার সঙ্গে আর।

সেইদিন থেকে সাবধান হয়ে গিয়েছিলুম। অফিস-সংক্রান্ত কথা না থাকলে ঢুকিনি পর্যন্ত সমীরবাবুর ঘরে। উনি বারবার চেষ্টা করেছেন কথান্তরে যেতে। আমি মোড় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছি তাকে অন্যদিকে। নিউ এম্পায়ারে 'আকাশ-প্রদীপের' আজকের শো'য়ের কথাটা পর্যন্ত জানাইনি।

তবে আজ সন্ধ্যায় কিছুটা চপলতা বোধহয় প্রকাশ পেয়ে থাকবে আমার আচরণে। লাইট হাউস ব্রেসারিতে দেখলুম যখন ওঁকে, আনন্দে চমকে উঠেছিলুম, সে অভিব্যক্তি কি তবে ফুটে উঠেছিল আমার চোখে আমার মুখে? তাইতেই কি সমীরবাবু ভুল বোঝার অবকাশ পেলেন? তারপরে অরুণ লাহিড়ীর সঙ্গ ছেড়ে চলে এলুম ওঁর সঙ্গে। দীর্ঘদিন পরে অকস্মাৎ আমার ভাবান্তর দেখেই কি সমীরবাবু দুই আর দুয়ে চার করলেন?

কিন্তু এ যে একেবারে মিথ্যে! সমীরবাবুকে অকস্মাৎ দেখতে পেয়ে

খুবই খুশি হয়ে উঠেছিলুম তা মানি, কিন্তু সে বোধ হয় যে-কোন পরিচিত জনকে দেখেই হতুম সে মুহূর্তে। আসলে তখন আমি যে করে হোক ঐ অরুণ লাহিড়ীকে এড়াবার জন্তেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলুম।

অতিষ্ঠ করে তুলেছিল লোকটা!

অভিনয় আরম্ভ হবার আগে থেকেই দলের আর সবাইকে ছেড়ে আমার স্থবিধে অস্থবিধের ওপর বড় বেশি নজর রাখছিলেন অরুণ লাহিড়ী।

স্থকাদিকে আড়ালে পেয়ে বলতে গেলুম কথাটা, মুচকি হেসে সরে গেল। সারাটা সময় লজ্জিত হয়ে কাটাতে হলো। অভিনয় শেষ হলে যখন নিতান্ত অন্তরঙ্গের মতো কাঁধ চাপড়ে প্রশংসা করতে শুরু করলেন উনি তখন কিন্তু বিরক্তি চরমে উঠেছিল আমার। তারপর সে হাত আর নামে না কিছুতে! প্রস্তাব করেলন লাইট হাউস ব্রেসারিতে নিরিবিলিতে একটু বিশ্রাম করে যাবার জন্তে, কয়েকটা ভারী জরুরি কাজের কথাও না কি রয়েছে।

আমি তখন বাইরে আসতে পেলে বাঁচি! বাবার জ্বর দিন সাতেক আগে থেকে, ডাক্তার বলেছেন বাঁকা পথ নিচ্ছে। সব চেয়ে ভয় হার্ট ওঁর ভারী উইক।

স্থকাদিকে বহুবার বলেছিলুম আজকের নাটকে আমাকে ওরা রেহাই দিক। বললে—তাই কি হয়? কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, তারিখ এনাউন্স করা হয়েছে, বুকিংএ প্ল্যান প্রায় ভর্তি হয়ে এলো, এখন এমনি করে ডোবালে চলে? কতক্ষণই বা লাগছে, বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে আটটা, নটার মধ্যে নিশ্চয় ফিরতে পারবি বাড়িতে।

এখন অভিনয় যদি শেষ হলো তো লাহিড়ী আটকে ফেললেন কাজের কথার ছল করে। কথা তো ভারী! উনি ছবি তুলবেন 'মায়া রাত্', আমি হবো তার নায়িকা সবিতা। ওঁর প্রত্যেক ছবিতেই নাকি একটি করে নতুন মুখ চান্স পেয়ে আসছে বরাবর, নিরাশ করেনি তাদের কেউই। আমার ওপরেও যথেষ্ট আস্থা ওঁর। বললেন, বাবাকে রাজি করার ভার উনি নিজে নিচ্ছেন।

উত্তর দেবো কি, ভেতরে ভেতরে ঘামতে শুরু করেছি ততক্ষণে। এমন সময়ে উদ্ধার করলেন এসে সমীরবাবু।

অবশ্য তাতে লাভই বা হলো কি! শুধু এক জল থেকে অন্য জলে পড়লুম। এমন একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটে গেল, কাল অফিসে ঢুকবো কি করে তাই ভাবি।

গলির মধ্যে ঢুকে একটু এগিয়েই চক্রবর্তী বাড়ির লম্বা টানা রোয়াক। তার দুদিকে দুটি মজলিশ বসে নিয়ম করে। এ-পাশেরটি বুড়োদের ও-পাশেরটি কচিদের। কচি মানে, যাদের বয়স আঠারো থেকে আটত্রিশের মধ্যে। বুড়োদের আড্ডা ভাঙে সন্ধ্যে হলেই, এঁরা এই রাত দশটাতেও বসে এখনো।

বাড়ির সামনে পৌঁছে দেখি গাড়ি দাঁড়িয়ে দরজায়। পিছনের কাচে লাল অক্ষর ক'টি নির্দেশ করছে ডাক্তারের আগমন ঘটেছে এ বাড়িতে।

রমেন দাঁড়িয়েছিল রোয়াকে, আমাকে দেখতে পেয়েই অদৃশ্য হলো ভেতরে।

অক্ষয় কাকা বেরিয়ে এলেন, ভারী গলায় বললেন,—এসেছো মা? এসো! রোগা মানুষকে একা ফেলে নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছো, বাপ যে ওদিকে চললো।

শুনে পাথর হয়ে গেলুম, তারপর ছুটে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলুম।

প্রায় শেষ রাতে আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে হঠাৎ পরিপূর্ণ চোখ মেলে তাকালেন বাবা। বললেন, বাঁশী তোর মাকে বসতে একখানা আসন দিলি না ? দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই থেকে !

চমকে ফিরে পিছনে তাকালুম। দেওয়ালে মা'র ছবিখানা টাঙানো ছিল, সেই যে ছিঁড়ে পড়ে গিয়ে ভেঙে গেছে কাচখানা বাঁধানো হয়নি আজো, তুলে রেখেছি ট্রাঙ্কের মধ্যে। খালি জায়গাটার ওপর চোখ পড়লো। মুখ নামিয়ে বললুম, ও কিছু না, তুমি ঘুমোও বাবা।

বাবা তার একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লেন !···

···একে একে অনেকগুলি ছায়া পড়লো ঘরে। ঠিক কে কে জানি না। বাড়ির বাসিন্দাদের অনেকেই এলেন। অক্ষয় কাকার স্ত্রী জোর করে টেনে তুললেন আমায় বাবার বুক থেকে।

ভোরের আলো ফুটলো।···

অক্ষয় কাকার ঋণ শোধবার নয়। বললেন, তুমি কিছু ভেবো না বাঁশীমা, সব ব্যবস্থা আমরা করছি। তোমার আত্মীয়দের কাকে খবর দিতে হবে বলো, আমি চেষ্টা করি লোক পাঠাবার।

হঠাৎ একেবারে অসহায় মনে হলো নিজেকে। কে আছে আমাদের ? আত্মীয়দের কারো সঙ্গেই তো বনিবনা রাখেন নি বাবা ! এক ছিলেন মামা, তিনিও গত বছরে দিল্লীতে বদলি হয়ে গিয়েছেন।

অক্ষয় কাকা বললেন, ফোনে কাউকে ডাকলে চলে তো বলো, চার তলায় বাড়িওলার ফোন রয়েছে।

অনীশদার কথা মনে হলো। কিন্তু তিনি সবে ফোন পেয়েছেন দিন কতক আগে, নম্বরটাতো জেনে রাখা হয়নি!

সমীরবাবু খুব কাছেই থাকেন অবশ্য। কিন্তু না, থাক!

ছোট সায়েব মজুমদারের কথা মনে হলো। উনি যে হোটেলে থাকেন কতবার ফোন করেছি অফিসের কাজে।

কিন্তু?

এই কি আমার কিন্তু করার সময়!

সাত
জয়ন্তীর কথা

এ বাড়িটা আমাদের শহরের নাগাল পেরিয়ে কতটুকুই বা, অথচ মনে হয় অনেকখানি দূরে। পল্লীটি শান্ত এবং নতুন। আর নতুন বলেই বাড়ি ক'খানার প্রত্যেকটিই আধুনিক ডিজাইনের। একটার সঙ্গে অন্যটার মাপ-জোক করা দূরত্ব। আলো রোদ্দুর চেপে এ ওর গায়ে ঠেকে নেই কেউ। এক তলার ঘর কখানাও ভোর থেকে রোদে ভাসে।

সব চেয়ে ভাল লাগে সামনের রাস্তাটা। কালো পিচে আলো পড়ে ঝক্‌ঝক্‌ করছে সারা দিন। এধারে-ওধারে সার-বাঁধা রাধাচূড়া দেবদারুর ছায়ায় লুটোপুটি খেতে খেতে ক্রাইষ্ট চার্চ স্কুলের কোল ছুঁয়ে সিধে চলে গেছে বিমান ঘাঁটির দিকে! প্লেনগুলোও মজা লাগে দেখতে। এত নিচু দিয়ে উড়তে দেখিনি আগে! ঘরে-দোরে ছায়া পড়ে। শব্দ শুনে সচকিত চোখ চেয়ে দেখি উড়ে চলেছে ছায়া পাখি, এই ঘরের মেঝেয়, এই টেবিলের কাচে, এই অনীশের শাদা-জামা-পিঠে, দেখতে দেখতে উড়ে যায় ছাত টপকে বাগান ডিঙিয়ে, সামনে ইলা চৌপাঠিদের লন পেরিয়ে।

প্রথম প্রথম লাগতো বেশ। অনীশকে বলতে গেলে ভাবতো বানিয়ে বলছি। কলকাতার মেয়ে, ভাল লাগছে না এ পাড়াগাঁ। ও তাই ভোলাতো আমায়। সুপুরি গাছের ফাঁকে চাঁদ দেখিয়ে কবিত্ব করতো। পাখির গলার ডাক চেনাতো কোন্‌টা পাপিয়া কোন্‌টা বউ-কথা কও। মাঝরাতে উড়ো জাহাজের বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে গেলে বলতো,

আমরা দু-জনে ঐ প্লেনের যাত্রী যেন, যাচ্ছি অনেক যোজন দূরে মেঘের দোলায় ভেসে। ওর কোলের কাছটিতে শুয়ে সদ্য-ঘুম-ভাঙা-চোখে সত্যিই মনে হতো বুঝি কোন্ সুখের আকাশে ডানা মেলেছি দুজনে।

মুস্কিল কিন্তু দুপুরে। যতক্ষণ ও বাড়িতে ততক্ষণ সবই মিষ্টি। এরিয়েলের বাঁশে কাঠ-ঠোকরার ঠক্ ঠক্ শব্দটি পর্যন্ত। বেরিয়ে যাবে ও সাড়ে দশটায়। কলেজ করে ট্যুইশনি সেরে ফিরতে কোনদিন সাতটা, কোনদিন সাড়ে সাত। এদিকে এগারোটা না বাজতেই সংসারে সকালের পাট শেষ। তারপরে শাশুড়ীকে যোগবাশিষ্ঠ পড়ে শোনানো, সে আর কতক্ষণ! আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টারের মধ্যেই চোখ বুজবেন তিনি, আমি উঠে চলে আসবো নিজের ঘরে। দুপুরে ঘুমের অভ্যাস কোন কালেই নেই। সারাটা দুপুর আর কাটতে চাইবে না কিছুতেই। সময় যাবে এ-ঘর ও-ঘর করে,...সেলাই সুতো নিয়ে,...দেশ কিংবা বসুমতী ঘেঁটে, নয়তো অনীশের বইয়ের আলমারি গুছিয়ে। খানিকক্ষণ বা ছাদের আলসেয় দাঁড়িয়ে ভিজে চুলের রাশ শুকিয়ে, কিছুটা সময় রেডিওর প্রোগ্রাম শুনে।

শেষে একদিন বলেই ফেললুম। খোঁজ নিচ্ছিল টিয়া চন্দনার ঝাঁকটা—রোজকার মতো দুপুরে এসেছিল কিনা বাগানে। এই দুটো মাস না কি প্রত্যহ আসবে ওরা, সূর্যমুখীর ফুলের বোঁটার দিকগুলো খাদ্য হিসেবে প্রিয় ওদের খুব।

বললুম, আমার অত পাখি-পাখালি দেখার সখ নেই। বাইরের দালানে একটা দোলনা খাটিয়ে দেবো বরং, ছুটির দিনে বসে বসে পাখির রঙের খেলা দেখো তুমি। আমি দোল দিতে দিতে ছড়া পড়বো খন—আয়রে পাখি নেজ-ঝোলা খোকন নিয়ে কর্ খেলা।

—বাঃ, গ্র্যাণ্ড আইডিয়া! গুজরাটিদের শুনেছি প্রত্যেক বাড়িতে কাঠের বড় বড় দোলনা খাটানোর রেওয়াজ। ছোট-বড়-মাঝারি যে বয়সিই হোক না, ফাঁক পেলেই এক পাক দোল খেয়ে নেয়। ··তাই আনবো 'খন, কিনতে তো সেই হবেই শেষে, ততদিন বউনিটা আমরাই সেরে রেখে দিই।

—আঃ থামো, অসভ্য কোথাকার! মা রয়েছেন না ও ঘরে?

—বেশ, এই থামলুম। কিন্তু গলাটা যেন বেসুরো লাগছে আজ? ভাল লাগছে না এখানে? না কি মা'র কাছে বকুনি হয়েছে দুপুরে?

—মোটেও না, মা অমন শুধু শুধু বকেন না আমায়।

—তবে? ভাল লাগছে না বুঝি এখানে? গম্ভীর হয়ে গিয়ে অনীশ বললে।

—তাই কি বলেছি আমি? যতক্ষণ তুমি থাকো বেশই তো লাগে, বাকি দিনটা কিন্তু কাটতে চায় না কিছুতেই। অল্প খাটুনি অথচ মাইনে মন্দ না এমনি একটা চাকরি পাইতো বেশ হয়। এক সঙ্গে বেরোই রোজ সকালে। উঠি একই বাসে! তারপর শ্যামবাজারের মোড়ে নেমে তুমি তোমার পথে, আমি আমার। বিকেলে আবার, আগে ছুটি হবে যার অপেক্ষা করবো অন্যজনের জন্যে, ফিরবো এক বাসে।

—ভালই তো, তোমার সিটের কোণ ঘেঁসে একটু তবু বসে আসতে পাবো, রড ধরে সারা পথ ঝুলতে হবে না আর।—কথাটা ঠাট্টার সুরে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে বটে, মুখে কিন্তু ছায়া পড়ে এলো ওর।

বুঝি সব! পৌরুষে ঘা লাগলো বাবুর। কি যে কমপ্লেক্স ওর, সব সময়েই সন্দেহ, যেন ওর অল্প আয়ের জন্যে খোঁটা দিচ্ছি আমি।

সেদিনের কথায় কিন্তু ফল হয়েছে দুটো। এক নম্বর, সন্ধ্যের দিকে ও ফিরছে একটু তাড়াতাড়ি। দ্বিতীয়ত, হপ্তায় একটা দিন নির্দিষ্ট

হয়েছে দুজনে এক সঙ্গে খুব খানিকটা ঘুরে বেড়াবার জন্তে। স্বভাবতই শনিবার, কারণ সেদিন ওদের কলেজে আর্টসের ক্লাশ থাকে না কোন। শাশুড়ী প্রথম দিকে দিনকতক গম্ভীর হবার চেষ্টা করেছিলেন, ক্রমে হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

রোববারটাও কাটে মন্দ না। আমাদের সেদিন বেরুতে হয় না। কলকাতাই চলে আসে এখানে। মানে, কলকাতা থেকে কেউ না কেউ আসবেই সেদিন, তা সে আমার পক্ষের আত্মীয়রাই হোক, কি ওর তরফের বন্ধুরাই হোক। কারো সখ ছিপ নিয়ে ধৈর্য পরীক্ষার, কারো ইচ্ছে আড্ডা জমিয়ে গাল-গল্প, কেউ আসবে ওর সঙ্গে মুখোমুখি বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু তর্ক করার লোভে।

এ বারের রোববারটা কিন্তু একদিন আগেই এসে গেল।

বেলা দশটা হবে। রান্না করছি। অনীশ এসে দাঁড়ালো পেছনে। দাড়ি কামাচ্ছিল, গালে একরাশ সাবানের ফেনা।

—এই শীগগির! কে এসেছে দেখবে চলো।

—ভাগ্! চালাকির জায়গা পাওনি? হরতাল না আজ, একটি গাড়ি নেই রাস্তায়, কে আসবে শুনি?

দেখবেই চলো না। সুনন্দন মজুমদার এসেছে। বললে, শ্যাম-বাজারের মোড় থেকে লাফ মেরেছিল, একেবারে আমাদের বাগানে এসে নেমেছে।

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বললুম, বিদ্যেটা তো তোমারই একচেটে জানতুম।

—সেই কথাই তো বলছি, জুটি মিলেছে এত দিনে।

প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চললো।

ঢুকে দেখি চুরুটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ঘরখানা। পাখাটা ফুল স্পিডে ঘুরছে। ইজি চেয়ারখানায় জাঁকিয়ে বসে সুনন্দনবাবু।

আমায় দেখে ভব্য হয়ে বসলেন। হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, অবাক করে দিয়েছি তো?

—তা দিয়েছেন। সত্যি, এলেন কি করে?

—কেন, অনীশবাবু বলেন নি? সরবে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন সুনন্দনবাবু। বললেন, পরিচিত এক ডাক্তারের অস্টিনে এসেছি শ্যামবাজার পর্যন্ত, বাকি পথটা পা-গাড়িতে।

—অর্থাৎ হেঁটে এসেছেন এতখানি পথ?

—এতটা পথ মানে? শ্যামবাজার থেকে আপনাদের এ-বাড়ি খুব জোর মাইল তিনেক হোক?…হোটেলের মালিক যিনি, ওপরের তলাতেই থাকেন সপরিবারে। তাঁর স্ত্রীর হার্টের অসুখ। ডাক্তার বাবুটি হচ্ছেন ওঁদের গৃহ-চিকিৎসক। থাকেন শ্যামবাজারে। সকালে জানলায় মুখ বাড়িয়ে যখনই দেখেছি ডাক্তারের গাড়িটা দাঁড়িয়ে নিচের গেটে, তখুনি প্ল্যান ছকে ফেলেছি। সদা চঞ্চলা কলকাতা হঠাৎ ঝিম মেরে পড়ে থাকলে কেমন লাগে, দেখতে সাধ হয়েছিল। এখানে আসার কথাটাও এক সঙ্গেই ঠিক করে নিলুম। শ্যামবাজার থেকে সেই তো হেঁটেই ফিরতে হতো, না হয় উল্টো দিকেই এলুম! এক বেলার জন্যে তবু তো অন্নপূর্ণার আতিথ্য গ্রহণ করতে পাবো…কিন্তু আর কথা নয়, সে জন্যে সারা দুপুর আছে, এখন আগে এক কাপ—

—এই যে এখুনি আনি। আপনার জন্যে চমৎকার কফি এনে রেখেছে আপনার বন্ধু!

এক-আধ জন মানুষ থাকে, সঙ্গে যেন হাসি-খুসির হাওয়া নিয়ে ফেরে, সুনন্দনবাবুকে নিঃসন্দেহে সেই গোত্রে ফেলা যায়। সেই জন্যেই জমেছে অত অনীশের সঙ্গে। দাদা ঠিকই চিনেছিলো আগে। বাস্তবিক চমৎকার লোক! একটা শুধু দোষ, মুখটা একটু আলগা; লজ্জায় পড়তে হয় যখন-তখন।

সারাটা দুপুর অবিচ্ছিন্ন আড্ডা চললো। একথা-সেকথা, স্বদেশের এবং বিদেশের নানান গাল-গল্প। মাঝখানে একবার শুধু অলক্ষ্য ছায়া পড়লো ঘরে, যখন বাঁশরীর কথা তুললে অনীশ।

বললেন, আসেনি এর মধ্যে আপনাদের এখানে?

—দিন বারো আগে এসেছিল একবার। কেমন যেন ছন্নছাড়া হয়ে পড়েছে মেয়েটা।

অনীশ বললে, আপনাদের ফার্মও নাকি ছেড়ে দিচ্ছে শুনলুম! সেই সূত্রেই এসেছিল এখানে, একটা কাজের খবর নিয়ে, চেষ্টা-চরিত্র করে ঢোকাতে পারি যদি! আমাদের এদিকেই। একটু আগে যে মিশনারী স্কুলটা রয়েছে ওখানে একজন শিক্ষয়িত্রী নেবে। তবে ওদের দরকার অন্তত ইণ্টারমিডিয়েট পাশ মেয়ে, বাঁশরী তা নয় তো। একটা সুরাহা, ওর গানের কোয়ালিফিকেশনটা রয়েছে। স্কুল ফাইন্যালের সিলেবাসে মিউজিক তো রয়েছেই কিনা! থাকার সমস্যাও মেটে তাহলে, চমৎকার হোস্টেল—ব্যবস্থা ওদের।···দেখি কতদূর কি করা যায়।

—থাকার সমস্যাটাই প্রধান ওর, আমি বললুম। বাড়িওয়ালা বললে নোটিশ দিয়েছে, আত্মীয় অভিভাবকহীন একা মেয়েকে রাখা

সঙ্গত মনে করেন না তিনি। কোথা থেকে কি ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসবে কে জানে!

চুপ করে শুনে যাচ্ছিলেন সুনন্দনবাবু। মুখ দেখে মনে হয় কোনো কথাই অজানা নয় ওঁর। বললেন, হ্যাঁ চক্রবেড়ে রোডের কাছে এক প্রাইভেট বোর্ডিংয়ে চেষ্টা করছিল কদিন ধরে।

অনীশ জিজ্ঞেস করলে, ওর বাবার সেই তিন হাজার টাকার লাইফ ইনস্যুরেন্স পলিসিটার গতি হল কিছু?

—গত পরশু পাওয়া গিয়েছে টাকাটা,—সুনন্দনবাবু জবাব দিলেন।

—আপনি বন্ধুজনোচিত অনেক করলেন ওর জন্যে। অনীশ বললে।

—আমি? কিছুমাত্র না! ঢের বেশি করেছেন আপনি!

কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে অনীশ বললে, কিন্তু অমন চাকরিটা ছাড়ছে কেন বলুন তো? অসুবিধে হবার তো কথা নয় কোন!

—সে জন্যে নয়। বোধ করি সমীরের সঙ্গে মতান্তর হয়ে থাকবে কিছু!

—মাঝখানে কিন্তু মনে হয়েছিল যথেষ্ট সখ্যতারই সঞ্চার হয়েছে দুজনের মধ্যে, অনীশ মন্তব্য করলে।

সুনন্দনবাবু নিরুত্তর।

আমি অনুমান করতে পেরেছিলুম খানিকটা। আরতির একখানা চিঠিতে আভাস ছিল, কিন্তু এক্ষেত্রে নীরব থাকাই ভাল।

একটু বাদে সুনন্দন বাবু বললেন, আমিও বোধ হয় শীগগিরই ছেড়ে দিতে পারি ওদের ফার্ম!

—অবাক গলায় অনীশ বললে, সে কি? আপনি যে শুনেছিলুম ওদের পার্টনার হয়েছেন?

—না তো! মৌখিক সেরকম একটা কথা কওয়া আছে বটে, কাগজে কলমে নেই কিছু।

—সেই কারণেই ছাড়বেন নাকি?

—না না, তা কেন? ওঁদের কথায় যথেষ্ট আস্থা আমার। বিশেষ করে আপনাদের জ্যেঠামশাই যতদিন রয়েছেন,—দেবতুল্য ব্যক্তি!

—কিন্তু আপনাকে এখন ছাড়লে অকূলে পড়বে যে ওরা।

সুনন্দনবাবু হাসলেন,—ভাই, কারো জন্যেই আটকায়না কারো। এত দিনের কারবার ওঁদের, আমি তো এসেছি মোটে কদিন।

—তবু ছেড়ে দেবেন হঠাৎ? মনোমালিন্য হয়েছে কোনো?

—না, সে-সব কিছু নয়। বুঝেছি কি বলতে চাইছেন আপনি, আরতি দেবীর সঙ্গে বিয়ের সেই প্রস্তাবটা তো? সে আমি মোটামুটি বুঝিয়ে দিতে পেরেছি আপনাদের জ্যাঠাইমাকে। তিনিও ক্ষমা করেছেন আমার অক্ষমতা।...আসল কথা কি জানেন,—নিভে যাওয়া চুরুটে কাঠি জ্বালতে জ্বালতে সুনন্দনবাবু বলতে লাগলেন, ভাবছি নিজেই একটা ছোটখাট ফার্ম স্টার্ট করি। অনেকদিন পরের তাঁবেদারি করে কাটলো, ভালো লাগে না আর। এককালে টাকার অভাবে কষ্ট পেয়েছি যথেষ্ট। দুঃখের কথা তা সত্ত্বেও টাকার মূল্য বুঝতে শিখলুম না কোনদিন, দোষটা আমার পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া। পরবর্তীকালে টাকা হাতে এসেছে মুঠো মুঠো, কিন্তু সঞ্চয় করে রাখতে শিখিনি কিছু।...কিন্তু আর না, বাউণ্ডুলেপনা আর কিছুতেই না। গত সিজনে যে টাকাটা এলো ফুরোবার আগেই কাজে লাগাবো।

—এ হলে উত্তম প্রস্তাব অবশ্য, অনীশ সমর্থন করলে। বললে, হ্যাঁ, বাইরে বাইরেই ঘুরলেন এত দিন, এবার স্থিতু হয়ে বসুন কোথাও।

আমি যোগ করলুম, অমনি আপনার ঐ হোস্টেলটাও ছাড়ুন সেই সঙ্গে। হোটেল মানেই মনে হয় শ্রীহীনের আড্ডা। নিদেন ছোট দেখে একটা ফ্ল্যাট নিন সুবিধে মতো।

সুনন্দন বাবু বললেন, তাই ভাবছি।

অনীশ হেসে উঠলো, ঘরই খুঁজবেন শুধু, ঘরণী নয়?

সুনন্দন বাবুর মৃদু গলা, সে কথাও ভাবছি।

—সত্যি? দুজনে সমস্বরে বলে উঠলুম।

অল্প ভারী হয়ে এলো গলাটা ওঁর, বললেন, বলি তাহলে আপনাদের। এখন বুঝতে পেরেছি, এই কথাটাই প্রকাশ পাবার জন্যে পাখা ঝাপটাচ্ছিল বুকের মধ্যে, সাত সকালে টেনে এনে হাজির করলে এখানে।

বাইরে বাগানে গেটের মাথায় মাধবী লতার ঝাড়টি নানা রঙের ফুলে আলো-হাসি হাসছে, কয়েক মুহূর্ত চেয়ে চেয়ে দেখলেন সুনন্দন বাবু। তারপরে মুখ ফিরিয়ে অনীশের চোখে চোখ রেখে বললেন, আজ এই পাঁচ মাস হলো ভালবেসেছি একটি মেয়েকে। ভেবেছিলুম নিজে তাকে সে কথা জানাবোনা কোনদিন, সে আপনি বোঝে বুঝুক। বুঝেছে সে মেয়ে এতদিনে, তার নিজের মনও বুঝিয়েছে আমায়। আপনারা চেনেন তাকে উভয়েই। বিশেষ অনীশ বাবুকে সে সহোদর বড় ভাইয়ের তুল্য মনে করে।...অনীশ বাবু, আপনার কাছে আমি বাঁশরীর পাণি ভিক্ষা করছি। দেবেন?

শুনে চমকে উঠলুম দুজনে। বিস্ময় গোপনের প্রয়াস না করেই অনীশ বললে, দেবার মালিকানা যদি আমার হাতে মনে করেন, তবে সে আপনি পেয়েই গিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো? তলে তলে এতখানি এগোলেন কবে?

আমি যোগ দিলুম, হ্যাঁ, অবাক করে দিলেন যে আপনারা! বাঁশরীও তো আ[illegible]াপা মেয়ে, সেদিন এলো আভাসটুকু পেলুম না!

সুনন্দন বাবু হাসলেন।

অনীশ প্রশ্ন করলে, তবে পাঁচ মাসই বা হয় কি করে? সে সময়ে তো রেঙ্গুনে আপনি! ফেব্রুয়ারি প্রায় শেষ করে ফিরছেন, তার আগে তো দেখা হবার কথা নয়!

লাজুক গলায় সুনন্দন বাবুর জবাব, না তার আগেই, আপনার সঙ্গে যেদিন প্রথম পরিচয় আমার, সেই দিনই। মনে আছে তো? ডিসেম্বরের চব্বিশে সেটা। আপনাদেয় ছেড়ে সেই যে চলে গেলুম হঠাৎ। জানি সেদিন আমার ওপর অপ্রসন্ন হয়ে উঠেছিলেন আপনি। কিন্তু কি করবো অন্য উপায় ছিল না।

আমি অনীশের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলুম।

ও বললে, সেদিন বুঝি বাঁশরীকে দেখেই ছুটেছিলেন অমন দিশাহারা হয়ে! প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ার যুগ এখনো পার হয়নি তাহলে!

ভারী গলায় সুনন্দন বাবু উত্তর দিলেন, না, প্রথম দর্শনেই প্রেম এতটা বলা সঙ্গত হবে না। তাছাড়া, এই যে আমার প্রথম প্রেম তাই বা বলি কি করে! এর আগে, কৈশোর যৌবনের সন্ধিকালে আরও একবার ভালবেসেছিলুম আমি, অপর একটি মেয়েকে।

বাধা দিয়ে অনীশ বললে, সাংঘাতিক লোক তো মশাই আপনি! নির্বিকারে স্বীকারোক্তি করে চলেছেন, জানেন এখন কন্যাপক্ষের লোক আমি?

সহজ ভাবে সুনন্দন বাবু বললেন, স্বীকারোক্তি যতখানি সম্ভব সরল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সত্যিই আর একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলুম আগে। ভালবাসা পেয়েও ছিলুম।

—ইণ্টারেস্টিং লাগছে কিন্তু খুব। আমি মন্তব্য করলুম।

—সে অন্য ইতিহাস। আজ আর নয়, পরে একদিন বলার ইচ্ছে রইল।···

প্রসঙ্গ বদল করে অনীশকে বললেন, একটা কথা, আমাকে একটু করে সাহিত্য পড়াবেন আপনি?

অবাক হয়ে অনীশ শুধোলে, পড়াবো মানে?

—অন্তত বেশ কিছু প্রথম শ্রেণীর বইএর নাম আমায় দিন। বিশেষ করে বাংলা কবিতা।

বললুম, হঠাৎ এ সখ আপনার?

—সখ নয় ঠিক, প্রয়োজন বলতে পারেন। সেই কলেজে পড়ার যুগে একটু আধটু গ্রন্থচর্চা হয়েছিল, তার পরেই শেষ। দেশে বিদেশে যাযাবরের মতো দিন কেটেছে, সময় মিলেছে কম। যদিও বা অবসর মিলেছে কখনো কখনো, বই বলতে হাতের কাছে সহজে পেয়েছি সস্তা সিরিজের রহস্য রোমাঞ্চ আর এ্যাডভেঞ্চার, নিকৃষ্ট যত ক্রাইম থ্রিলার। এদিক থেকে এ অধম ডক্টরেট পাবার যোগ্যতা ধরে জানবেন।··· কিন্তু সৎগ্রন্থ পড়ার অভ্যাস হারিয়েছি বহুদিন। হাসবেন না শুনে। আজকাল বাঁশরীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সময়ে সময়ে কেমন যেন অসহায় মনে হয় নিজেকে, মেয়েটা বই এর পোকা একেবারে।··· তাছাড়া অধুনা আমার ধারণা হয়েছে, ভাল কবিতা মাঝে মাঝে না পড়তে পেলে চিত্তবৃত্তির গঠন সুসমঞ্জ হতে পারে না মানুষের।

অনীশ ওঁর কথা শুনে হেসে উঠলো। আমিও যোগ দিলুম সঙ্গে। বললুম, মস্ত আবিষ্কার করে ফেলেছেন তো?

উঠে দাঁড়িয়ে অনীশ বললে, অন্তত খান দুই বই তাহলে আপনাকে দিতেই হয় আজ। সেলফ্ থেকে সঞ্চয়িতাখানা আর বুদ্ধদেব বসু

সম্পাদিত আধুনিক বাংলা কবিতার সঙ্কলনটি এনে সুনন্দন বাবুর সামনে ধরলে ও।

—কৃতজ্ঞ রইলুম। বাইরের জানলার দিকে চেয়ে সুনন্দন বাবু বললেন, এবার কিন্তু আমাকে উঠতে হয়, অতিথি আসছেন আপনাদের বাড়ি।

চোখ তুলতেই দেখি গেটের ওধারে আমাদের ওবাড়ির গাড়িখানা। আরতি ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছে, মাধবীর একটা উদ্ধত ডালকে নোয়াবার দুশ্চেষ্টা করছে। দাদা নামছে গাড়ি থেকে।

আমি বেরুতেই হৈ হৈ করে উঠলো দুজনে। আরতি বললে, আছিস তাহলে বাড়ি। আমরা ভেবেছিলুম বেরিয়ে গেছিস দুজনে। শনিবার বিকেলে তো থাকিস না বাড়িতে।

দাদা বললে, চারটের পর প্রথম ট্রামের শব্দ পেয়েছি রাস্তায়, আমাদের গাড়ি বেরিয়েছে চারটে কুড়িতে। জানি, পাঁচটা অবধি থাকবিই তোরা।

আরতিকে জড়িয়ে ধরে বললুম, বেরুবার কথা ভুলেই গিয়েছি দাদা, যা আড্ডা জমেছে। তোমার বন্ধু সুনন্দন মজুমদার এসেছেন যে।

দেখতে দেখতে মেঘ নেমে এলো দাদার মুখে। বললে তাই নাকি?

ঘরের মধ্যে ফিরে দেখি, বিদায় নেবার উদ্যোগ করছেন সুনন্দন বাবু।

দাদা জিজ্ঞেস করলে, এরই মধ্যে তুমি এসে পৌঁছুলে কোথা থেকে? সবে তো আধঘণ্টা হলো গাড়ি বাস চলছে রাস্তায়।

ওঁর হয়ে জবাব দিলে অনীশ। বললে, বা, উনি তো সেই সকাল থেকেই রয়েছেন এখানে।

……সুনন্দন বাবু চলে গেলে দাদা প্রশ্ন করলে, মজুমদার হঠাৎ এখানে এসে জুটেছিল যে?

—আসেন তো প্রায়ই।

—প্রশ্রয় দিস না বেশি। সুবিধের নয় লোকটা।

অনীশ শুধোলে, কি রকম? তুমিই না কদিন আগে পাঁচমুখে ওর প্রশংসা শেষ করে উঠতে পারতে না?

—ভুল হয়েছিল আমার। মানুষকে চিনতে সময় লাগে। তোমরা দুজনেই ঠিক ধরেছিলে তখন, লোকটা যথেষ্ট পরিমাণে সরল নয়।

আমি অনীশের দিকে চাইলুম। ও মৃদু হাসলে। দাদা কি জানেন তিনি যেমন তাঁর মত বদলে নিয়েছেন, আমরাও আমাদের ধারণা পালটে নিয়ে থাকতে পারি ইতি মধ্যে।

তাচ্ছিল্যের স্বরে দাদা বললে, কানাঘুষো শুনছি নিজে ইমপোর্টের কাজ শুরু করবে। দেখুক না করে কত ধানে কত চাল!··· বার্মা'য় এ বছর ওকে পাঠানোই ভুল হয়েছিল আমাদের, কত টাকা সরালে ওখান থেকে কে জানে? দুদিন যাক খবর পৌঁছুবে ঠিকই।

—আগে কিন্তু তুমি বলেছিলে, এ বছর কাজ অন্যবারের তুলনায় লাভ হয়েছে ঢের।

—এখন মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত নিজে ওখানে থেকে গেলে, আমিই আরো ভাল কাজ করতে পারতুম।

আমরা নীরব।

রাগে গরগর করতে করতে দাদা বললে, যাক না, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না। শুধু বিশ্রী একটা স্ক্যাণ্ডাল করে গেল এই যা।

অনীশ বিস্মিত হয়ে বললে, স্ক্যাণ্ডাল?

—না তো কি? ঐ তোমার পাতানো বোন বাঁশরী, যাকে ফার্মে বহাল করলুম তোমার খাতিরে।···খুব জমেছে দুজনে আজকাল।

নায়ারের ঃ শুনছিলুম কিছু কিছু। অফিস ডিসিপ্লিন বলে কিছু রাখলে না আর। বেয়ারা পিওনগুলোও আড়ালে হাসাহাসি করে নিশ্চয়।

—বাঁশরীও তো শুনলুম ছেড়ে দিচ্ছে তোমার ফার্ম ?

সিগ্রেটের পোড়া টুকরোটা পায়ের তলায় পিষে দাদা জবাব দিলে ভালই করছে। নইলে অপমান করে তাড়াতে হতো ছুটোকে।

···একটু পরে পাশের ঘরে আরতির মুখে শুনলুম সব। দাদা না কি বদ্ধপরিকর হয়েছিল বাঁশরীকে বিয়ে করবে বলে। বাড়িতে জ্যেঠাইমার সঙ্গে খণ্ড প্রলয় হয়ে গিয়েছে এই নিয়ে। দাদা বলেছিল, এ বিয়ে হবেই। এখন বাঁশরী ঘুরে দাঁড়াতে বেচারার মুখ দেখাবার জো নেই বাড়িতে।

শুনে শঙ্কিত হলুম। দাদার রাগ তো জানি ছেলেবেলা থেকে। গুমরে গুমরে থেকে হঠাৎ কবে ফেটে পড়বে, বিশ্রী একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়বে।

সন্ধ্যের পর চলে গেল ওরা।

অনীশও বেরুলো ঐ গাড়িতে। আমাকেও যাবার জন্তে বললে আরতি অনেক করে, অনীশ ফেরার সময় নিয়ে আসবে। কিন্তু এখন গেলে কি চলে আমার ? সারা দিন গল্প গুজব করে এখন যদি শাশুড়ীকে রান্নাঘরে পাঠিয়ে নিজে চলি বাপের বাড়ি, তিনিই বা ভাববেন কি !

যাবার আগে দাদা রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে গেল একবার। বললে, এখানে যে তুই দুবেলা হাঁড়ি ঠেলিস এইটেই সব চেয়ে লাগে আমার। ও বাড়িতে থাকতে রান্নাঘরের চেহারা কেমন তাই জানতিস না। ডক্টর ব্যানার্জীর কাছে জ্যেঠামশাই তদ্বির করছেন খুব, বোধ হয় পোস্ট

গ্রাজুয়েটে লেকচারারের একটা কাজ মিলে যাবে অনীশের। আগে একটা রাধুনি ঠাকুর রাখিস বাপু।

শুনে হেসে ফেললুম। কি যে বলো দাদা, মেয়েদের আবার রাঁধতে কষ্ট নাকি? ভারী তিনটে মানুষের তো রান্না তাও অর্ধেক শাশুড়ীই করেন।

অনীশ যাচ্ছিল সামনে দিয়ে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, কি হে, রান্নাঘরের মধ্যে কি সলা-পরামর্শ হচ্ছে ভাই বোনের? আমার বিষয়ে নয় তো কিছু?

দাদা উত্তর দিলে, তোমার আজকের ডিনারের ম্যেনু দেখছিলুম। যেদিনই আসি শুনি মাংস চড়েছে, অত মাংস খাওয়া ভাল না হে, ব্লাড প্রেসার বাড়ে।

অনীশ বললে তা কি করি বলো? সারা দিন হরতাল গেল, মাছ ছিল নাকি বাজারে? চাকরটা গিয়ে তাই এবেলা মাংস নিয়ে এসেছে। ···আর মাংস যদিও নিয়মিতই খাই পরিমাণে কিন্তু কম। তাছাড়া হালকা ভাবে স্টুএর মতো করে রাঁধলে মাংস মাছের চেয়েও সহজ পাচ্য ডাক্তারি মতে। তিন নম্বর হলো, মাংসে পুষ্টি যে কোন খাবারের চেয়ে অনেক বেশি। আর চার হলো—বাজারে সব জিনিস পত্রেরই দাম চড়তে শুরু করেছে আবার,—যে জন্যে জেনারেল স্ট্রাইকই হয়ে গেল আজকে। মাংসের দরটাই কেবল এখনো আগের দামে রয়েছে।

হাসি মুখে দাদা বললে, তোমার ঐ পয়েন্ট সাজিয়ে ইতিহাসের মাস্টারি করার ঢংটা ছাড়ো দেখি।···যাই বলো, বেশি মাংস খেলে সাত্ত্বিক ভাব নষ্ট হয়ে আসে, সংযমের শক্তি কমে যায়।

অনীশ বললে, তুমি ব্যাচিলর হয়ে বসে রইলে, সংযম নিয়ে মাথা ঘামাও গিয়ে।···তাছাড়া যুক্তিটাও বাজে তোমার। হাঁস দেখো,

পায়রা দেখো, কিইবা খাচ্ছে সারা দিনে, কাদা পাঁক ধানের খোসা,—এদিকে পাখায় পাখা জড়িয়ে বসে আছে সর্বক্ষণ। অপরদিকে সিংহ বাঘ দেখো, মাংসাসী বটে, তাই বলে অসংযমী নয় কিন্তু, তাদের মিলনের একটা নির্দিষ্ট ঋতু রয়েছে।···হাসছো যে? যুক্তিটা আমার নিজের নয়, এ ধরণের একটি উক্তি করেছিলেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব।

—রেফারেন্সটা খুঁজে বের করেছো যাহোক! সারা চৈতন্যচরিতামৃত খুঁজে আর কিছু পেলে না বুঝি?

ঘর থেকে পালিয়ে বাঁচি আমি। এক একটা কথা বলে অনীশ একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো। সুনন্দনবাবুর সঙ্গে মিশে দিন দিন বাড়ছে এটা।

কেউ আর বাকী রইল না আজ।

ওরা গিয়েছে ঘণ্টা খানেকও হয়নি। শাশুড়ী ডাকলেন, বৌমা দেখে যাও কে এসেছে।

গিয়ে দেখি ওঁর পায়ের কাছে বসে বাঁশরী।

হাসিমুখে বললুম, এসো ভাই।

হাসিটা যে আন্তরিক হলো না নিজেই বুঝলুম। কি জানি, দুপুরে সুনন্দনবাবুর মুখে ওদের আসন্ন মিলনের শুভ সংবাদ শুনে কতই না খুশি হয়ে উঠেছিলুম, কখন যেন উবে গিয়েছে সেটা। ওকে দেখা মাত্র শুধু এই কথাটাই মনে হলো যে, এই দর্পী মেয়েটা প্রত্যাখ্যান করেছে আমার দাদাকে।

শাশুড়ী বললেন, ওকে এখানেই দুমুঠো খাইয়ে দিও মা।

বললুম, না হলে ছাড়ছি নাকি?

বাঁশরী কিন্তু রাজী হলো না কিছুতে, বিকেলে রান্না করে এসেছে, বললে সেগুলো নষ্ট হবে মিথ্যে।

আমার ঘরে নিয়ে গেলুম ওকে। কথায় কথায় স্কুলের চাকরিটার কথা উঠলো, ভাবলুম বলি আর কি দরকার তোমার কাজ খুঁজে! কিন্তু ইচ্ছে করেই তুললুম না ও প্রসঙ্গ। বললুম, তোমার দাদা তো চেষ্টা করছেন খুব।

ওর হাতে একটা প্যাকেট লক্ষ্য করেছিলুম, যাবার আগে খুলে বললে, বৌদি, দেখুন তো দাদার টেবিলে কেমন মানাবে এটা। ওঁর জন্যেই করেছি আমি।

দেখলুম। সুন্দর হয়েছে কাজটি। কচি কলাপাতা রঙের কাপড়ের কোলে খয়েরি সুতোর ফুলগুলি খুলেছে চমৎকার।

—বাঃ, সুন্দর তৈরি করেছো তো! তোমার দাদা দেখলে খুশি হবেন খুব!

—দাদার পছন্দ মতোই তো করেছি এখানা। এই রঙটি সব চেয়ে প্রিয় ওঁর।

বুকে যেন ধাক্কা দিলে কে। বললুম, তাই নাকি! তুমি জানলে কি করে? আমি তো জানতুম সব রঙের ওপরেই সমান পক্ষপাতিত্ব তোমার দাদার। কিংবা হবেও বা, জানিনা আমি। রঙ নিয়ে মাথা ঘামাতে তো দেখিনি ওকে কখনো।

অপ্রস্তুত হয়ে বাঁশরী বললে, আমায় বলেছিলেন যে!

আপাদমস্তক জ্বালা করে উঠলো আমার। বটে! অনীশকে চিনিনা আমি, ওর কাছে যাবে রঙের ফরমাশ করতে? সাংঘাতিক মেয়ে তো? দেখতে ভাল মানুষটি, বড় বড় চোখে সরলতা মাখানো, ভেতরে তার এই! দিন কতক দাদাকে নিয়ে খেলেছে, এখন বেচারা

সুনন্দনবাবুকে ক্রীড়নক করে মর্জি মতো নাচাচ্ছে, আবার এ খেলনা পুরোনো না হতেই নতুন একটির দিকে হাত বাড়ানো হচ্ছে।

অনীশই বা কি? সমানে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে মেয়েটাকে! আজকাল দেখি বাঁশরীর কথা উঠতে বসতে। এই বললে বাঁশরী, এই করলে, বাঁশরীর বড় কষ্ট! ওর স্কুলের চাকরির জন্যে নিজের জুতোর গোড়ালিটাই খইয়ে ফেললে। বাঁশরীর গান থাকলে বেতার জগতে আবার আগে থাকতে দাগ দিয়ে রাখা হয়! গত রোববার সকালে পঙ্কজ মল্লিকের আসর শুনছি। বললে, গান শেখার এত শখ তোমার, ভালই হলো, বাঁশরী তো এদিকেই আসছে শীগগির।

খুব সুবিধে হয় দুজনের তাহলে, না?

আচ্ছা, আমিও দেখাচ্ছি!

আট

সুনন্দনের কথা

অনীশবাবু শুধোলেন, চুপ করে গেলেন যে? কি ভাবছেন?

—ভাবছি কোথা থেকে শুরু করি। কতটুকু বলি, কতটাই বা ছাড়ি। আপনি অধ্যাপক মানুষ, দরকারি অদরকারি বাছতে পারেন সহজে, ঝড়তি-পড়তি বাদ দিয়ে কাজের অংশটি লাল পেন্সিলের দাগে চিহ্নিত করতে পারেন চট করে, আমার তো তা নয়।

হাসিমুখে অনীশ বাবু বললেন, কাজ কি আপনার সে চেষ্টায়? আমি কিছু সত্যিই আপনার প্রথম প্রেমের আখ্যান শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে নেই!

একটু চুপ করে থেকে জবাব দিলুম, কিন্তু আমার যে প্রয়োজন আপনাকে বলার। শুনলে আপনার ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, পরন্তু আমার লাভ আছে। সুতরাং—

—উৎকর্ণ হয়ে বসি? নিন আরম্ভ করুন!

দুজনে বসে আমার হোটেলের কামরায়। চা খাওয়া শেষ করেছি একটু আগে। বাইরে জ্যৈষ্ঠ বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরে শেষ অগ্নি আভা। সামনের পার্কে ছেলেদের ফুটবল খেলার ভিড় সেই মাত্র ভেঙেছে। কথার কথায় সেদিনের শেষ না হওয়া গল্পের প্রসঙ্গ উঠেছে। অনীশবাবু বলেছেন, কৌতূহল হচ্ছে অস্বীকার করি না, তবে দেরি হয়ে গিয়েছে আজ, পরের রোববার তো আসছেন আমার ওখানে সেইদিন বরং শোনা যাবে। আমি বাধা দিয়েছি, প্রায় জোর করে

বসিয়ে রেখেছি ওঁকে। তারপর আরম্ভ করতে গিয়ে খেই হারিয়ে আকাশ পাতাল ভাবছি বসে বসে।—

গোড়াতেই তার নামটি বলে রাখি,—মিলা। আরো দেড়খানা অক্ষর ছিল ঐ সঙ্গে, সব কটা জুড়লে পুরো নামটি হয় শর্মিলা। আমি ডাকতুম মিলা বলে।...অবশ্য কদিনই বা ডেকেছি তাকে, কটা দিন আর ডাকতে পেয়েছি ও নামে! মোটে তিনটি মাস, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর, উনিশশো সাঁয়ত্রিশ। ঠিক মতো হিসেব করলে অক্টোবরেরও দিন বারো যোগ করা চলে। আমার বয়স তখন আঠারো, পড়ছি সেকেণ্ড ইয়ার সায়ান্সে, স্কটিশচার্চে। ও এসে ভর্তি হলো, ফার্স্ট ইয়ারে। আমিই করালুম।

—আপনি করালেন মানে? আগে থেকেই চিনতেন তাহলে বলুন?

বললুম, তাকে বোধ হয় চেনা বলে না। হ্যাঁ, এর আগেও দেখেছি ওকে, কথাও বলেছি এক-আধবার। কিন্তু সে শুধু চোখের চাওয়া, তাকে দেখা বলে না! সে শুধু মুখের কথা, তাকে কথা বলে না।

—সেই আদিপর্ব থেকেই শুরু করুন তবে, বুঝতে সহজ হবে।

—সেই ভাল, একেবারে গোড়া থেকেই বলি।

আমাদের ছেলেবেলায় পাটনার নিউ-মার্কেটে সবচেয়ে বড় স্টেশনারি দোকান ছিল যেটি, তার মালিক রঞ্জনবাবু ছিলেন মিলার বাবা। খুব নাকি পয়মন্ত মেয়ে, তাই ওরই নামে দোকানের নাম শর্মিলা স্টোর্স।

আমাদের বাড়ি ছিল শহরের মাঝামাঝি। ওদেরটা স্টেশনের কাছাকাছি পাড়ায়। এতটা পথের ফাঁক সত্বেও দু-বাড়ির মধ্যে সামান্ত যে একটু ঘনিষ্ঠতা ছিল তার প্রথম হেতু অবশ্যই এই যে, প্রবাসে বাঙালী মাত্রেই পরস্পরের সাহচর্যকামী, দ্বিতীয় কারণ ওখানকার সার্বজনীন কালীপূজো কমিটির রঞ্জনবাবু ছিলেন ট্রেজারার, আমার বাবা সেক্রেটারি। আরও একটি কারণ ছিল, পরে সেইটেই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়, আমার দাদা আর মিলার দাদা,—রঙ খুব ফরসা বলে তাঁকে আমরা রাঙাদা' বলে ডাকতুম,—স্কুলে পড়ার সময় থেকেই সহপাঠি ছিলেন এবং সেই সূত্রে সখ্যতায় নিকটতর।

দু-পরিবারের বন্ধন দৃঢ়তর হলো যখন আমার দাদা টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে একুশ দিনের দিন চলে গেলেন সবাইকে কাঁদিয়ে। আমি সেবার ক্লাশ নাইনে। দাদার অসুখের কদিন যে শ্রম আর সেবা করলেন রাঙাদা তা প্রায় তুলনারহিত। দাদা মারা গেলে পর মা'র যখন প্রায় অর্দ্ধোন্মাদ দশা, রাঙাদার মা'ই এসে সামলে তুললেন তাঁকে।

···সময় তার মায়া-জাল ছিটিয়ে সব দাহেরই উপশম ঘটায়। দাদার জন্যে সারা বাড়ির সেই জ্বলন্ত শোকও স্তিমিত হয়ে এলো দিনে দিনে। স্তিমিত হয়ে এলো কথাটা ইচ্ছে করেই বললুম, কারণ নিভে গেল তা তো বলতে পারিনা! সে শক্তি কালের নেই। কোন দুঃখ, কোন বেদনা, কোন কান্নাই মোছেনা; বাইরে হয়তো দেখিনা, ভেতরে সে থাকেই অন্তঃশীলা ফল্‌গুটি হয়ে।

দু-পরিবারের মিত্রতা কিন্তু সেই যে ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল, ক্রমে ক্রমে সেটা বেড়েই চললো, অন্তঃপুরে মেয়েদের মধ্যে তো বিশেষ ভাবেই প্রসারিত হলো।

মিলা তখনো নেপথ্যে। কিংবা ঠিক নেপথ্যেও বলা যায় না তাকে।

রঙিন ফ্রক পরা অতি চঞ্চলা একটি মেয়ে মাঝে মাঝে এসেছে আমাদের বাড়ি তার মায়ের সঙ্গে বেড়াতে, ওদের বাড়িতেও সাক্ষাৎ হয়েছে কদাচ কখনো। হয়তো বাইরের ঘরে বেতের চেয়ারে বসে সরবে দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধ মুখস্থ করছে, না হয় সমবয়সী এক পাল মেয়ে জুটিয়ে গুলতুনি করছে সামনের আমতলায়।

…বছর ঘুরে গেল।

রাঙাদা এই সময়ে সরকারি চাকরি নিয়ে কলকাতা চলে এলেন। প্রথমে দিন কতক মীর্জাপুর স্ট্রীটের কোন মেসে ছিলেন বুঝি। তারপরে ঘরে এলেন রাঙা বৌদি। যুগলে নীড় বাঁধলেন শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর সামনে সদ্য তৈরি এক ফ্ল্যাট বাড়ির চারতলার টঙে। তারও বছর-খানেক বাদে আমি যখন প্রবেশিকা পাশ করে কলকাতা এসে কলেজে ভর্তি হয়েছি রাঙাদা ও বৌদি তখন নতুন অতিথির আগমন সম্ভাবনায় স্বপ্নজাল বুনছেন, আর দিন গুনছেন। ভুল বললুম, মাস গুনছেন!

বাধা দিয়ে অনীশবাবু বললেন, ভূমিকাটা বেশি দীর্ঘ হয়ে পড়ছে নাকি?

সহাস্যে জবাব দিলুম, অধুনা শুনি সেইটেই নাকি রীতি। কিন্তু ঘাবড়াবেন না, আমার সে বাসনা নেই। তবে রাঙাদা, বিশেষ করে বৌদি, এমন ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছেন এ উপাখ্যানে যে, ওদের কথাটা সংক্ষেপ করা সঙ্গত হবে না। তবে যতখানি সম্ভব চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

—রাঙাদার গুণের কথা বলছি আপনাকে। কেমন করে আমাদের পরিবারে আপন জনের মতো হয়ে গিয়েছিলেন তিনি, তাও শুনেছেন।

কিন্তু বৌদিকে বর্ণনা করি এ সাধ্য আমার নেই। এখনো সন্দেহ যায়নি, তাঁকে কি চিনতেই পেরেছি ঠিক মতো। অথচ যথেষ্ট নিকট থেকেই দেখেছি তাঁকে, পুরো এক বছরেরও অধিককাল ধরে। সত্ত শহরে আসা গেঁয়ো ছেলেটির জীবনে, আমার সেই কলেজ আরম্ভ করার প্রথম দিনগুলিতে বৌদি ছিলেন একাধারে সুহৃদ, উপদেষ্টা, সচিব, তথা শ্রদ্ধাভাজন গুরু।

অবারিত দ্বার ছিল আমার ওঁদের ফ্ল্যাটে, আর তা সম্ভব অসম্ভব যে কোন সময়েই। বিডন স্ট্রীটের হস্টেলে থাকতুম, হপ্তায় তিনদিন বিকেলে কম্পালসারি রুটিন ছিল ছুটির পর ওঁদের ওখানে গিয়ে ঘণ্টা দুয়েক অবিচ্ছিন্ন আড্ডা দেওয়া। আর সে কি শুধু আড্ডা, তাকে একটা আসর বলাই বোধ করি বেশি সঙ্গত। আজ মনে হলে হাসি পায়, তখন কিন্তু সন্দেহ জাগতো আমাদের সব চেয়ে নামী প্রফেসরও বোধ হয় বৌদির মতো অত-শত বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। সাহিত্য বিজ্ঞান থেকে শুরু করে গান-বাজনা খেলাধূলো, মায় হলিউডের রোমাঞ্চকর চুটকিগুলো পর্যন্ত নখদর্পনে ওঁর। পরিবেশন ভঙ্গিটিও ছিল তেমনি অনবদ্য। হাঁ হয়ে শুনতুম দুজনে। দুজনে মানে, রাঙাদা যেদিন বাড়ি থাকতেন। আমি তো ভক্ত ছিলুমই, মনে হতো রাঙাদাও বৌদিকে ভালবাসার চেয়ে শ্রদ্ধা ভক্তিই করেন বেশি।

এক কথায়, সহজ একটা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ছিল বৌদির সর্ব অবয়ব ঘিরে—মেয়েদের মধ্যে যেটা প্রায় ক্ষেত্রেই দুর্লভ। কতবার কত বিষয়ে কোমর-বেঁধে তর্ক করতে গিয়েছি ওঁর সঙ্গে, চশমার ছ-কোনা লেন্সের ঝকঝকে চাউনি হেনে উনি শুধু হেসেছেন মৃদু মৃদু, তারপরে বাক্যবাণে অতিষ্ঠ করে ছেড়ে দিয়েছেন।...আহা, হেরেও সুখ ছিল রাঙাবৌদির কাছে। কারণ তারপরেই রান্নাঘরের একধারে কাঠের পিঁড়িতে উবু হয়ে

বসে ওঁর নিজের হাতে তৈরি গরম গরম কাটলেট, অভাবে হিঙের কচুরি নিদেনপক্ষে ঝাল তরকারি আর ডালপুরী খেয়ে চাঁদপানা মুখ করে বিদায় হয়েছি।…

এমনি করে কলকাতার প্রথম তিন মাস শেষ হলো। পূজোর ছুটিতে বাড়ি গেলুম।

আশ্চর্য! এই পাটনায় জন্মাবধি সতেরোটা বছর কাটিয়ে গিয়েছি। এবারে সতেরোটা দিনও কাটতে চায়না কিছুতে। পূজোর কটা দিন বারোয়ারি তলায় কাটলো। তারপর থেকেই কবে যাই, কবে যাবো?

একদিন মা ধরলেন, ব্যাপার কি বল্ দেখি তোর? একদম মন টিঁকছে না বোধ হচ্ছে এখানে?

বাবা হেসে বললেন, ওটা কলকাতার হাওয়ার দোষ, আর কোথাও তিষ্টোতে দেয় না সহজে।

বাস্তবিক! কি যেন যাদু জানে কলকাতা। সে যাদুতে একবার যে মজেছে আর কোনখানে গিয়েই স্বস্তি নেই তার, মুক্তি নেই!

ট্রেনে ক্রমেই ভিড় বাড়বে এই অজুহাতে ছুটি ফুরোবার কদিন থাকতে চলে এলুম।

ফিরে সেই দিনই বিকেলে হাজির হয়েছি বৌদিদের ফ্ল্যাটে। গিয়েই মন ভরে উঠেছে অকারণ খুশিতে। সেই পরিচিত ঘর তিনখানি, দক্ষিনের এক চিলতে ছাদে টব সাজিয়ে সাজিয়ে রাঙাদার সেই বাগান রচনা; দরজা জানলার পর্দায়, টেবিলের ঢাকায়, বিছানার চাদরে, রাঙা বৌদির পছন্দ করা সেই বহু চেনা বর্ণ সুষমা।

উঠে দাঁড়িয়ে আপ্যায়ন করলেন রাঙাদা। বললেন, আয়, বিজয়ার কোলাকুলিটা সেরে নিই আগে। বৌদি হাসি-হাসি মুখে পাশে এসে দাঁড়ালেন। চেয়ারের ওপর পা তুলে আমি আমার নিজস্ব ভঙ্গিতে বসলুম।

রাঙাদা শুধোলেন, তোর কলেজ খুলবে সেই ভাই-দ্বিতীয়ার পরে, এখনো তার দিন সাতেক দেরি। এর মধ্যেই চলে এলি যে?

ভাই-ফোঁটার কথায় মায়ের ওপর প্রচ্ছন্ন অভিমানটা ঝাঁঝিয়ে উঠলো আমার। বললুম, আমার তো আর বোন নেই, মিথ্যে কটা দিন নষ্ট করে লাভ?

হো হো করে হেসে উঠলেন রাঙাদা, তাই তো, অত্যন্ত দুঃখের কথা!...শুনছো? বোন নেই বলে দুঃখ করছে নন্দন, তুমিই না হয় দিদি হয়ে যাও আজ থেকে ওর!

সস্নেহ চোখে ছ-কোনা লেন্সের আলো ফেলে বৌদি বললেন, তুমি হুকুম করবে তবে হবো? জিজ্ঞেস করো না কে হই আমি ওর। কার টানে ভাই-ফোঁটার ঠিক মুখোমুখি ফিরে আসতে হলো ওকে।...

সত্যিই নিমন্ত্রণ পেলুম সেবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন। বালিগঞ্জ থেকে আরো দুটি ভাই এসেছিলেন ওঁর, তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আমার কপালেও চুয়া-চন্দনের ফোঁটা আঁকলেন বৌদি, যমের দুয়ারে কাঁটা ছড়ালেন। শাঁখ বাজলো, প্রদীপ জ্বললো। একপেট খেয়ে, ম্যাটিনী শো'য়ে সকলে মিলে চিত্রায় 'দিদি' দেখে সন্ধ্যের পরে হস্টেলে ফিরলুম যখন, মাটির আধ হাত উঁচু দিয়ে হাঁটছি।

অনীশবাবু উঠে পড়ার ভান করলেন। বললেন, এইটুকুই থাক আজ, নইলে অনেক দেরি হয়ে যাবে। যাকে নিয়ে গল্প তারই তো পাত্তা নেই এ পর্যন্ত!

—অধৈর্য হবেন না দয়া করে! বিরক্ত হচ্ছেন জানি। ভাবছেন রাঙা বৌদির কাহিনী এমন সাত কাহন করে বলছি কেন? উপায় নেই, পরের ঘটনাগুলো অনুধাবন করতে হলে এ মহিলাটিকে চিনে রাখা একান্ত প্রয়োজন।···যা হোক মোটে আর একটি দিনের কথা বলেই শেষ করে দিচ্ছি রাঙাবৌদির প্রসঙ্গ।

মাঘের শেষ। কলকাতায় বসন্তের প্রাদুর্ভাব হয়েছে যথা নিয়মে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে কর্পোরেশনের ইস্তাহার পড়েছে, 'শহরে বসন্ত এসেছে, সত্বর টিকে নিন।'

টেনিসে ক-সেট পর পর হেরে ফিরলুম সেদিন। যন্ত্রনায় মাথা তুলতে পারছিনা। সারা গায়ে অসম্ভব ব্যাথা। রুমমেট ধ্রুব বোসকে ডেকে বললুম, দেখ্‌তো রে, জর হচ্ছে নাকি আমার?

ও আমার নাড়ি ধরে নিবিষ্ট মনে পরীক্ষা করে বললে, ও কিছু না। তারপর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, কিন্তু সারা মুখখানাতে কি হয়েছে বল্ দেখি তোর? যেন মশা কামড়ানো দাগের মতো?

ততক্ষণে গলার কাছে কান্না ঠেলে এসেছে আমার। কি উপায় এখন? এই বিদেশে-বিভুঁয়ে বিশ্রী একটা রোগে পড়লে, কেউ তো নেই আমার!

আলোটা নিভিয়ে দিয়ে দরজা ভেজিয়ে শুয়ে পড়লুম।

ধ্রুব গিয়ে ওদিকে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টকে খবর পৌছে দিয়েছে, হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলেন তিনি। সেই দিনই সকালে হস্টেল শুদ্ধ ছেলের ভ্যাকসিনেশন হয়ে গেছে শুধু আমি ছিলুম গরহাজির। সেই উপলক্ষ্য ধরে গোড়াতেই খানিকটা ভৎর্সনা লাভ হলো, তারপর লোক্যাল গার্জেনকে খবর দেবার কথা উঠলো!

আমি বেঁকে দাঁড়ালুম। রাঙাদা বৌদিকে ওর মধ্যে জড়াবো এর চেয়ে লজ্জার কি হতে পারে আর! তাছাড়া বৌদির কোলে সবে এক মাসের বাচ্ছাটা। বললুম, ওঁদের খবর দিয়ে লাভ নেই কিছু, তার চেয়ে আমায় হস্পিট্যালে রিমুভ করুন। পরে জানাবেন ওঁদের।

সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট তখনকার মতো বিদায় নিলেন। ধ্রুবকে তার বিছানাপত্র বার করে নিতে বললেন ঘর থেকে।

আমি ঘরে একা। মার মুখখানা ভাসতে লাগলো চোখের সামনে। সুখে-দুঃখে, সুদিনে-দুর্দিনে-আত্মীয় সঙ্গী কত আসে কত যায়, রোগ হলে কিন্তু মাকেই মনে পড়ে সর্বাগ্রে, আর কাউকে নয়।

যথাকালে এ্যাম্বুলেন্স গাড়ি এলো এবং আমায় তুলে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হলো হাসপাতালে। পরের দিন বিকেলে খবর পেয়ে দেখতে এলেন রাঙাদা-বৌদি। তারপরে যে কদিন ছিলুম প্রত্যহ। ঐটুকু সময়ের জন্যে রোগের সকল যন্ত্রনা যেন মুছে যেতো আমার। ভুলিয়ে দিতেন বৌদি অসহায় হয়ে হাসপাতালে পড়ে রয়েছি।

রোগটা ভাগ্যক্রমে অল্পের ওপর দিয়েই গেল। সুস্থ হয়ে ফিরলুম কদিন পরেই। পরের দিন ভোরে কাক পক্ষী ডেকেছে কি ডাকেনি রাঙাদার চাকর এসে হাজির আমার হস্টেলে, হাতে বৌদির এক লাইন চিরকুট, পত্র পাঠ যেন দেখা করি ওঁদের বাড়ি গিয়ে।

গেলুম। বৌদি বেরিয়ে এলেন। পরনে তসরের লাল পাড় কাপড় একখানা, জামা নেই গায়ে, ভিজে চুলের রাশ পিঠের পরে মেলা। মাথায় একটি রক্ত জবার ফুল ছুঁইয়ে মুখে কফোঁটা চরণামৃত ঢেলে দিলেন। বললেন, মা শীতলার কাছে পূজো মানৎ করেছিলুম তোমার জন্যে, ভালয় ভালয় তুলে দিয়েছেন মা।

বলতে বলতে জল এসে গিয়েছিল বৌদির দুচোখে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই তাঁকে এই অপ্রত্যাশিত নতুন মূর্তিতে দেখে আমা হেন পাষণ্ডও অভিভূত হয়ে পড়েছিল কিছুক্ষণের জন্যে। এতখানি তো আশা ছিল না আমার। রাঙাদা না হয় আত্মীয়ের সমান হয়েই গিয়েছেন কিন্তু বৌদির সঙ্গে পরিচয় সে যে পুরো একটি বছরও হয়নি এখনো !

কিন্তু আর না। শর্মিলা এসে দাঁড়াবার সময় হলো এবারে।

ফার্স্ট ইয়ার শেষ হয়েছে। ফিরেছি পাটনায়।

জুনের মাঝামাঝি। আমার ওখানকার এক বন্ধু রঞ্জিত একদিন বললে, শর্মিলা স্টোরের শর্মিলা না কি কলকাতা যাবে পড়তে ? তোদেরই কলেজে দরখাস্ত পাঠিয়েছে ?

জবাব দিলুম, কই আমি তো কিছু শুনিনি ?

—একটা সুন্দর মেয়ে বাকি ছিল পাড়ায়, সেও চললো। দূর দূর, পাটনায় থেকে আর কোন সুখ নেই ! তাদের স্কটিশে নাকি দুধারে কেবল ফোটা ফুলের মেলা ?

তোর বি, এন, কলেজ ছেড়ে চল্‌না কলকাতায়। গিয়েই দেখিস'খন।

—বাড়িতে ছাড়বে না ! বলে একুশ বছরে কোন রকমে ম্যাট্রিকটা গলেছিল, আর কলকাতা গিয়ে ধাষ্টামো করতে হবে না !···ও তোরাই যা ভাই, মাঝে মধ্যে চিঠি পত্রে শুধু একটু-আধটু ছিটে-ফোঁটা ছাড়িস।

সেই দিনই বাড়ি ফিরে মার মুখে সবটা জানলুম। রঞ্জন কাকার মেয়ে শর্মিলা পাশ হয়েছে থার্ড ডিভিসনে। ওদের ইচ্ছে কলকাতা গিয়ে

পড়ে। রাঙা বৌদিরও কোলে কচি বাচ্চা, সঙ্গী একজন নিতান্ত দরকার। তাছাড়া রঞ্জন কাকারা সকলেই না কি চলে যাবেন কমাস পরে এখানকার পাট তুলে, মাড়োয়ারিদের সঙ্গে কম্পিটিশনে দোকান একদম চলছে না আর।

পরের দিন বিকেলে রঞ্জনকাকা নিজেই এসে হাজির। বললেন, পড়াশুনোয় খুব নাম তোমাদের কলেজের, আমি নিজেও ওখানকারই ছাত্র ছিলুম, ভাবছি শর্মিকে ওখানেই ভর্তি করি। রাঙা খোকার বাসা থেকেও মোটামুটি কাছে পড়বে।···তুমি কি বলো? মেয়েটাও ঝোঁক ধরেছে সায়ান্স পড়বে, এখানে তো কোন মতেই তা হবে না।

বললুম, কোন ডিভিসনে পাশ করেছে?

উনি বললেন, থার্ড ডিভিসনে।

—সায়ান্সে তো নেবে না তাহলে!

—তা জানি বলেই তো এলুম তোমার কাছে। তুমি কলেজের নাম করা ছেলে, প্রিন্সিপ্যালকে বলে যদি রাজি করাতে পারো। তাছাড়া অঙ্কে নম্বরটা উঁচুই রয়েছে। ছয়ের কোঠায়।

—সে হলে নিতেও পারে। দেখি আমি গিয়ে জানাবো আপনাকে।

জুলাইয়ের দু-তারিখে এলো শর্মিলা।

রাঙাদার ওখানে প্রথম দেখলুম যেদিন, অবাক লাগলো। বছর দেড়েক দেখা সাক্ষাৎ নেই, এরই মধ্যে সারা দেহটা কে যেন ভেঙে চুরে গড়েছে ওর।

অনীশবাবু হাসলেন, বললেন ঐ রকমই মনে হয়। একটা বিশেষ বয়সে পৌঁছে আমাদের পিছনে ফেলে ওরা হঠাৎ জোর কদমে এগিয়ে

চলে। আমাদের যৌবন সঞ্চারিত হয় একটু একটু করে, মোটামুটি সময় লাগে তিন থেকে চার বছর। আর ওদের যেন হঠাৎ এসে হাজির হয়, রাত পোহালেই কুলু কুলু জোয়ারের নদী।

—সেই কারণেই আমরা যে সময়ে হাফপ্যাণ্ট ছাড়ি ছাড়ি করেও ছাড়তে পারি না, ধুতির সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে চালিয়ে যাই আরো দিন কতক, ওরা তখন শাড়ি পরে রীতিমতো ভব্য-সভ্য মহিলা। আর একবার যে মেয়ে শাড়ির পাকে জড়িয়েছে নিজেকে তার পক্ষে আবার ফ্রকের মধ্যে মাথা গলানোর কথা,—চিন্তা করাই অকল্পনীয়।

যাক্, ক্লাশ তো শুরু হলো।

প্রথম দিন ওদের ছুটি পৌনে তিনটেয়।

আমার তখন লিজার যাচ্ছে, পরের ঘণ্টায় প্র্যাকটিক্যাল। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে ট্রামের স্টপেজ পর্যন্ত এগিয়ে দিলুম ওকে। বলা বাহুল্য, রীতিমতো অভিভাবকীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গেই কর্তব্যটুকু পালন করলুম। হায়, তখন কি জানি ওই মেয়ের কথাতেই উঠতে বসতে হবে কদিন পরে।

পরের সপ্তায় একদিন দুজনেরই ছুটি হলো, এক সময়ে। দেরি হয়ে গিয়েছে সেদিন। দুখানা ট্রাম ছেড়ে দিতে হলো ভিড়ের জন্যে। বাসের অবস্থাও তথৈবচ।

ও বললে, হেঁটেই চলে যাই আমি, এইটুকু তো পথ।

বললুম একা যাবে কেন, চলো গল্প করতে করতে আমিও যাই সঙ্গে।

—শ্যামবাজার ডিপোর কাছাকাছি পৌঁছে খেয়াল হলো, তাইতো, সবে গত কালই দেখা করে গিয়েছি বৌদির সঙ্গে! তাছাড়া একটা অন্য কাজও ছিল সন্ধ্যের দিকে।

বললুম, শোনো মিলা, এখান থেকেই ফিরছি আমি।

সহসা নতুন নামকরণ শুনে ও ঈষৎ বিস্ময়ের চোখে চাইলে আমার দিকে। বললে—বাড়ির এত কাছ বরাবর এসে দেখা না করে চলে গেলে বৌদি কিন্তু রাগ করবেন।

বললুম, কালই তো এসেছিলুম তোমাদের বাড়ি। বৌদির সঙ্গে একবার জমে গেলে, জানোই তো সন্ধ্যের এদিকে ছাড় নেই, একটা দরকারি কাজ নষ্ট হয়ে যায় তাহলে।…তাছাড়া,—একটু ভেবে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বললুম, আজকের এই পথটুকু গল্প করতে করতে এলুম দুজনে, লাগলো বেশ। আপত্তি না করো যদি, যেদিন যেদিন একসঙ্গে ছুটি হবে, এমনি করে পৌঁছে দিয়ে যাবো তোমাকে। নিয়ম করে একসঙ্গে দুজনকে ফিরতে দেখলে বৌদি হয়তো ভুল বুঝে বসবেন এদিকে। ভাববেন ছেলেমেয়ে দুটো আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করছে খালি।

সপ্রশ্ন চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল শর্মিলা।

—এক কাজ করলে হয়। আমি যে তোমার সঙ্গে ছিলুম, দরকার কি বৌদিকে বলে?

ও একটু চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় বললে, বেশ!

ওই সর্তই বজায় রইল দিন কয়েক।

অতঃপর দেখা গেল কি করে না জানি দুজনেরই ক্লাশ শেষ হচ্ছে একই সময়ে রোজ, এবং তারপর পাশাপাশি ছায়া ফেলে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের পশ্চিম ফুটপাথ ধরে হাঁটছি দুজনে। ফাঁকিটা দুজনের কারোরই অগোচর ছিল না, যদিও ভান করতুম অন্য রকম।

ফল হলো এই, বিকেলের দিকে রাঙাবৌদির আড্ডায় হাজিরা দেবার দিনগুলোয় ফাঁক পড়তে লাগলো ক্রমে ক্রমে।

একদিন ধরলেন বৌদি।—ব্যাপারখানা কি বলো দেখি নন্দন, আসোই না মোটে আর, এলেও উসখুস করো সর্বক্ষণ?

ওখানে যাওয়ার মাত্রাটা কি কারণে কমেছিল এতক্ষণ শুনলেন তা। আর উসখুস করারও কারণ ছিল বৈকি! কলেজে, বাইরে, রাস্তায়, শর্মিলার এক রূপ, বাড়িতে সে একেবারে সম্পূর্ণ অন্য মেয়ে। যেন চেনেই না আমায়! বৌদি ডাকলেন, এসে হয়তো চায়ের কাপটা বসিয়ে দিয়ে গেল টেবিলে, বৌদি বসতে বললেন তো বসলো এক কোণের চেয়ারে, হয়তো এক আধটা কথা বললো কিম্বা কোনদিন তাও না, মেয়ে একেবারে নিরুদ্দেশ।

কিন্তু ওসব কথা তো বলা যায় না বৌদিকে! কাজেই জোর দিয়ে বললুম, কি যে বলেন আপনারা! পরীক্ষা এগিয়ে আসছে, সময় পাই না মোটে, তাই। নইলে এ বাড়ির আকর্ষণ আমার আগের তুলনায় বেড়েইছে বরং। একেবারে দ্বিগুণ হয়েছেও বলতে পারেন।

হাতের সেলাই থামিয়ে ভ্রূ কুঁচকে শুধোলেন বৌদি, কি রকম?

—দেখুন না, আগে আসতুম শুধু আপনারই জন্যে, আর এখন? দোলনার কাছে গিয়ে ঘুমন্ত খোকনের গাল দুটো টিপে দিয়ে আদর করে বললুম, এখন ভাবি কে বেশি টানে আমায়!

পুত্রগর্বে বৌদির মুখখানা জ্বলজ্বল করতে লাগলো। বাচ্চাটা জেগে উঠে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল, কোলে তুলে নিয়ে বললেন, এই একরত্তি ছেলে এরই কি মামার ওপর টান কম ভাবো নাকি? দেখো না কেমন গরুর মতো ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে রয়েছে তোমার মুখে।

হেসে উঠলুম সকলে।

রাঙাদা প্রশ্ন করলেন, পড়াশুনো করছিস কেমন?

—বোলোনা আর। সারা ফার্স্ট ইয়ারটা ফাঁকি দিয়ে, চোখে অন্ধকার দেখছি এখন।

বৌদি বাধা দিলেন। থাক, আর বিনয় করতে হবে না, পরীক্ষায় তো স্ট্যাণ্ড করলে এদিকে!

হেসে উত্তর দিলুম, সে বৌদি একটা নিছক এ্যাক্সিডেণ্ট বলতে পারেন, তার ওপর তো হাত নেই কারো।

রাঙাদা বললেন, এখানে যেদিন আসিস, শর্মিকে একটু করে দেখলে পারিস তো, কি যে করবে মেয়েটা ভেবে পাইনা।

বৌদি থামিয়ে দিলেন, আর লোক পেলেনা খুঁজে? শুনছো নিজের পড়া নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে বেচারা!

—তাহলে থাক না হয়, রাঙাদা বললেন।—তবে পড়াতে আরম্ভ করলে ওর নিজের রিভিসনটাও হয়ে যেতো এক সঙ্গেই।

এত কাছে পৌঁছেও স্বর্গ থেকে বিদায়ের পরোয়ানা জারি হয়ে যায় বুঝি!···তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, না না এতে আর কি বাধা আছে, একটু আধটু দেখিয়ে দেবো বৈ তো নয়!

নতুন কাজে বহাল হলুম।

যেদিনই যাই, ফেরার আগে মিলার ঘরে গিয়ে খানিকক্ষণ মাস্টারি ফলিয়ে আসি। পড়াশুনো নামমাত্রই হয়, কারণ একটু বাদেই বৌদি গিয়ে হাঁক-ডাক করে তুলে আনেন, চলো চলো অনেক হয়েছে, সারা বছরের পড়া কি এক বেলাতেই মাথায় ঢুকিয়ে ছাড়বে নাকি?

গিয়ে আবার খানিক্ষণ বৌদির ঘরে বসি। এ ঘরে কিন্তু মাস্টার মশায় শুধু তিনি, আর সকলেই চেলা। রাঙাদা, মিলা, আমি—আমরা সকলে।

শেষের দিকে ভাল লাগতো না আর। কদিন আগেও বৌদির মুখের কথা শুনতে শুনতে অবাক বিস্ময়ে ভেবেছি কত শিখি ওঁর কাছে, কত বেশি জানেন বৌদি আমাদের চেয়ে। এখন দিনের পর দিন এর উল্টোটাই মনে হতে লাগলো খালি।···বড় বেশি জানেন বৌদি, বড় বেশি বলেন! লাভ কি অত জেনে-বুঝে, অত কথা বলে?···পাশের ঘরে যেখানে মাথা নিচু করে বসে পড়ছে মিলা সেখানে যেতে পেলে, টেব্‌ল-ল্যাম্পের ঐ আলো-বৃত্তের মধ্যে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে দুজনে বসে থাকতে পেলে অনেক বেশি সুখ এর চেয়ে! খাতার পাতায় দুজনে ট্রিগোনমেট্রির দুরূহ ত্রিভুজচর্চা করেও ঢের বেশি আনন্দ!

সেদিন ঘরে ঢুকে দেখি সামনে একখানা খাতা খুলে বোস স্টার্লিং-এর রেটরিক প্রসডিখানা নিবিষ্ট মনে ঘাঁটছে মিলা। বললে, ক্লাশের টিউটোরিয়েলে ওয়ার্ডসওয়থের 'ডেজি'র একটা স্ট্যাঞ্জা ছন্দ ভেঙে দেখাতে হবে তাই নিয়েই পড়েছে মুস্কিলে।

লাইন কটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললুম, এতো বেশ সহজই দিয়েছে দেখছি। সামান্য ভেরিয়েশন বাদে সবটাই আয়াম্‌বিক টেট্রামিটার।

ও বললে, আপনি করে দিন।

—তা কেন? নিজে একবার লাইন কটা উচ্চারণ করে পড় তো শুনি? দেখবে কোন কথাগুলোর ওপর এ্যাকসেণ্ট পড়ছে, আপনিই বেরিয়ে আসবে। আয়াম্‌বিকের নিয়ম তো জানোই। প্রথম সিলেবলটার ওপর স্ট্রেস পড়বেনা, দ্বিতীয়টাতে পড়বে।

চুপ করে রইল।

—কি হলো, পড়ো!

অপ্রতিভ হেসে বললে, আমার লজ্জা করে, আপনি একবার পড়ে দিন আগে।

অনীশবাবু নীরবে শুনে যাচ্ছিলেন এতক্ষণ। এবারে মুখ তুলে বললেন, দেখুন তো এই স্ট্যাঞ্জাটা কিনা 'ডেজি'র? এটার ওপরে প্রশ্নকর্তাদের ঝোঁক খুব।

"And all day long I number yet,
All seasons through, another debt.
Which wherever thou art met,
To thee 'am owing;
An instinct call it, a blind sense;
A happy, geneal influence
Coming one knows not how, nor whence
Nor whither going."

অকৃত্রিম বিস্ময়ে হাত দুখানা ঝাঁকি দিয়ে বললুম, অনীশবাবু আপনি একটি জিনিয়স! কেন যে ইতিহাসের সন তারিখের অরণ্যে অতীত খুঁজে মরেন, আপনার আসল সবজেক্ট হলো সাহিত্য।

লজ্জিত গলায় অনীশবাবু জবাব দিলেন, কমপ্লিমেণ্টের জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু ইতিহাসের ওপর অবিচার করবেন না তা বলে। এ কথাটা ভুলবেন না যে পৃথিবীতে এ পর্যন্ত কালজয়ী সাহিত্য যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তার অধিকাংশেরই উপাদান ইতিহাস থেকেই ধার করা! আসলে দুটোর মধ্যে রয়েছে অতি নিকটতর সম্বন্ধ।...কিন্তু ও প্রসঙ্গ থাক, আপনার গল্পের খেই ধরুন।—

—হ্যাঁ, এই যে!···কবিতাটি আমাকেই পড়ে শোনাতে হলো আগে। দ্বিতীয়বারের বার তাড়া খেয়ে কম্প্রগলায় মিলাও যোগ দিলে আমার সঙ্গে। পরেরবার ও একা পড়লে। লাইন কটা যে স্ক্যান করার কথা ভুলেই গিয়েছি ততক্ষণে। অকস্মাৎ চোখের সামনে নতুন ঘরের দরজা খুলে গিয়েছে।

শুধোলুম, ওসার্ডসওয়র্থের কবিতা তোমার কেমন লাগে মিলা?

ও একটু চুপ করে থেকে জবাব দিলে, সিলেবাসের বাইরে বেশি তো পড়িনি!

—তবু? এ কবিতাটা কেমন লাগলো?

বললে, ভাল।

উত্তেজিত হয়ে বললুম, শুধু ভাল? অপূর্ব নয়? তুচ্ছ একটা বারোমেসে ফুলকে ভালবেসে কত আদরই না করেছেন কবি! কিন্তু একি শুধু সেই বিশেষ ফুলটিকেই বলা? যে কোনো দেশে যে কোনো কালে যে কোন জনের মর্মবাণীই কি ধ্বনি তুলছেনা এর মধ্যে, যাকে যে ভালবাসে তার উদ্দেশে? তফাৎ শুধু কোথা জানো, আমরা তো এমন আশ্চর্য স্বরে বলতে পারিনা!

খাতার পাতায় পেন্সিল দিয়ে হিজিবিজি কি যেন আঁকছিল মিলা, উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু গলায় বললে বসুন আপনার চা আনি।

বাধা দিয়ে বললুম, অতখানি নার্ভাস হবার বিন্দুমাত্র কারণ ঘটেনি তোমার। তার চেয়ে এসো বরং লাইনগুলো সেরেই ফেলি। কিন্তু দোহাই তোমার চা আর এনো না। এই একটু আগে পর পর দু-কাপ চা গিলে এলুম ও ঘরে। উনুনে কি অহোরাত্র চায়ের জল চাপানো থাকে তোমাদের?

মুখ টিপে হেসে ও বললে, চায়ে আপত্তি থাকে অন্য জিনিস কি দেবো বলুন।

—কিছু চাইনা আমার, যাও তুমি!…পারবে দিতে, যদি বলি ঐ যে শাদা গন্ধরাজটি রয়েছে তোমার খোঁপায়, খুলে আমায় দাও?

অপলক চোখে কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে চাইলে মিলা। ফুলটা খোঁপা থেকে তুলে নিয়ে আলতো ছুঁয়ে রাখলে আমার হাতে।

দেখি অল্প অল্প কাঁপছে ওর হাতখানা।

ঠিক এই সময়ে বৌদির সাড়া পেলুম বারান্দায়। হাতখানা ছেড়ে দিয়ে ফুলটা মুঠোর মধ্যে আলগা করে চেপে বেরিয়ে এলুম ঘর থেকে।

—কি গো, এত তাড়াতাড়ি তোমাদের পড়াশুনো শেষ হয়ে গেল আজ?

আমার হার্ট এদিকে প্যালপিটেট করছে। বললুম, হ্যাঁ, বৌদি আজ আমি চলি, কাজ রয়েছে একটা।

—ও মা, দাঁড়াও দাঁড়াও বৃষ্টি পড়ছে যে বাইরে!

—তাই না কি? ও কিছু না, এইতো দরজা পার হলেই বাসে উঠবো।

রাস্তায় নেমে দেখি রীতিমতো ঝমঝম করে জল হচ্ছে বাইরে। সন্তর্পণে এদিকে ওদিকে চেয়ে ফুলটি এতক্ষণে নাকের কাছে ধরলুম, যেন চুরি করে এনেছি। হৃৎপিণ্ড থেকে দীর্ঘতম নিশ্বাস টেনে আঘ্রাণ নিলুম, চোখে মুখে কপালে বোলালুম। সেই ফুলের গন্ধে, চুলের গন্ধে পাগল হয়ে গেলুম একেবারে। পিছল ফুটপাথে মাতালের মতো এলোমেলো পা ফেলে সারা রাস্তা গান গাইতে গাইতে হস্টেলে ফিরলুম। মাথার ওপরে সারাক্ষণ বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই।

হাসি মুখে অনীশ বাবু শুধোলেন, গানও তাহলে আসে আপনার গলায় ?

—উঁহু, একটুও না। কিন্তু তাতে কি ? কণ্ঠে বিধাতা সুর দেননি বলে কি বুকেও সুরের ঝড় উঠবে না কখনো ? এ হলো সেই হৃদয়ের গান, গলার পরোয়া রাখেনা এ। ভাগ্যে বৃষ্টির জন্যে লোকজন পথে ছিল না কেউ, নইলে একটা অনর্থ বেধে যেতো নিশ্চয়।

—নেহাৎই বালক ছিলেন ! অনীশ বাবুর মন্তব্য।

—এ কথা আপনার কিছুতেই মানিনা। বয়স আঠারো বটে, কিন্তু পশ্চিমের ছেলে তো ? গঠনটা ছেলেবেলা থেকেই দরোয়ান গোছের। লম্বায় তখুনি ছ' ফুটের দাগ ছুঁয়েছি। কে বলবে বাইশ তেইশ নয় ? ছেলেবেলা থেকে সংস্কৃত কাব্য নেড়ে চেড়ে বুদ্ধিটাও একটু সকাল সকালই পেকেছিল।....তাছাড়া সব চেয়ে বড় কথা, আঠারো বছর বয়সটারই নিজস্ব একটা অহঙ্কার আছে, যৌবন স্পর্শনের অহঙ্কার ! ছেলে মানুষ আখ্যা দিলে এই সময়টা তাই বেশি করে বাজে।

অনীশবাবু সরবে হেসে উঠলেন,—উইথড্র করছি আমি, এতখানি আঘাত পাবেন ভাবিনি।...নিন, তার পরে বলুন—

—সারাটা পথ তো হাওয়ায় ভেসে ভেসে হস্টেলে ফিরলুম। রাত্রে বিছানায় শুয়ে অসহ্য আনন্দ-বেদনায় ঘুম এলো না বহুক্ষণ ধরে। বাইরে অনেক রাত করে মেঘ সরে গিয়ে এক ফালি চাঁদ উঠলো। চাঁদ তুমি কি আমায় বলে দেবে মিলা আমাকে 'তুমি' বলবে কবে ?

ক্লাশ শুরু হবার পর থেকে তৃতীয় মাসে নতুন এক উপসর্গের সূচনা হলো।

হলো একটা ক্যামেরা নিয়ে। সেই ছবি তোলাই শেষে কাল হলো আমার। কিনেছিলুম ওটাকে বছর খানেক আগে, ফার্স্ট ইয়ারের গোড়ার দিকে। দিন কতক মেতেও ছিলুম খুব। কলেজে বন্ধুদের থেকে শুরু করে হস্টেলে উড়ে ঠাকুর পর্যন্ত কাউকে ছাড়িনি। রাঙা বৌদিদের ছবি তো সে সময় অজস্র তুলেছিলুম। সুনামও হয়েছিল কিছু ছবি তোলার ব্যাপারে। তারপরে প্রথম ঝোঁকটা কেটে যেতে কবে থেকে যেন বাক্সবন্দী হয়ে পড়েই ছিল ওটা।

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি। আকাশে শরতের নীল রোদ্দুর। বৌদি একদিন জিজ্ঞেস করলেন, নন্দন তোমার সেই ক্যামেরাটার কথা শুনিনা যে আর? আছে তো?

—আছে মানে? এই তো সেদিন সেকেণ্ড হয়েছি নর্থ ক্যালকাটা এ্যামেচার ফটোগ্রাফি একজিবিশনে।

—সে তো এই নিয়ে একুশ বার শোনানো হলো।

—মোটেই না, মিথ্যুক!

—আমি তো চিরকালের মিথ্যুক।...এখন শোনো, সময় করে একদিন বাচ্চাটার কখানা ছবি তুলে দাও না!

—এই কথা? কালই বিকেলে আসছি আমি।

—না না, তাড়াতাড়ি কিছু নেই তেমন। সুবিধে মতো এনো একদিন। আরো আগেই বলতুম, যেরকম বর্ষা গেল এবার, আকাশের মুখ দেখে ভরসা করে বলিনি। কলেজ বন্ধ হতে আর কদিন রইল তোমার?

—অনেক দেরি। পূজো তো এবার কার্তিকে। তাছাড়া এবার বোধ হয় ছুটিতে যাবো না বাড়ি, খুলেই টেস্ট।...আমি তাহলে সামনের রোববার আসছি ঠিক। কেমন?

—বেশ! একটু সকাল সকাল এসো কিন্তু। অমনি এখানেই খেয়ে যাবে সেদিন রাত্রে। বুঝেছো?

—আচ্ছা!

যথা দিনে যথা সময়ে গেলুম। রাঙাদা শুনলুম একটু আগে বাইরে গিয়েছেন, মিলাকেও দেখা গেল না ধারে কাছে।

একরত্তি ছেলে ওর আর একার ছবি নেবো কি। সব কখানাতেই প্রায় বৌদি রইলেন সঙ্গে। কোন ছবিতে খোকন দোলনায় বসে, আদর করছেন বৌদি। কোনটাতে খোকনকে ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিচ্ছেন ফের। বারান্দায় দাঁড়ের কাছে গিয়ে খোকনের হাত নিয়ে উনি পোষা চন্দনার মাথায় বুলোচ্ছেন আর ঘাড় নিচু করে আদর খাচ্ছে পাখীটা, সে ছবিও তোলা হলো একখানা।

খান দুই মোটে ফিল্ম যখন বাকি, বললেন, দেখো সব যেন ফুরিয়ে ফেলোনা। ঠাকুরঝি তাহলে মুখ দেখবে না আমার।

ওঁর হাঁক-ডাকে দাঁড়ালো এসে মিলা। ছবি তুলবে এমন কোন প্রস্তুতিই চোখে পড়লো না। পরনে মিলের একখানা সাদামাঠা শাড়ি। চুলগুলো আলগা খোঁপায় কোনরকমে জড়ানো।

বৌদি দেখেই রেগে গেলেন। আচ্ছা ঠাকুরঝি, মতলবটা কি শুনি তোমার? শাড়িখানা পর্যন্ত বদলে রাখোনি, কখন থেকে বলছি তোমায়!

চুপ করে দাঁড়িয়ে বাঁ-হাতের আঙুলে আঁচলের খুঁটটি জড়াতে জড়াতে ও উত্তর করলে, রান্নাঘরে ছিলুম এতক্ষণ। তোমরা তোলোনা, আমার ওসব ছবি তোলার সখ নেই।

—কথা রেখে আগে যাও। সামনেই রেখে এসেছি সিল্কের ছাপা শাড়িখানা, পরে এসো চট করে।

ওর নিস্পৃহতা দেখে আমিও কিছুটা চটেছিলুম বলা বাহুল্য। বললুম, এখন আবার শাড়ি বদলানো মানেই তো আরো আধ ঘণ্টার ব্যাপার! ততক্ষণ কি আর আলো থাকবে, এরই মধ্যে তো রোদ মুছে এলো বাইরে! থাক আজ, অন্যদিন হবে আবার। আপনি বরং সেই স্পেশাল চা এক কাপ তৈরি করুন বৌদি, তেষ্টা পেয়েছে কখন থেকে।

—ওমা তাইতো, লক্ষ্মী ভাইটি, এখুনি আনছি। বৌদি চলে গেলেন।

—ছবি তোলাবেনা তবে তুমি? কেমন?

—যেমন আছি চলবে তো বলো, সাজতে-গুজতে পারি না এখন।

—চট করে এসো তবে ছাদে। ভাল হবেনা তেমন, এই আর কি!

—কাজ নেই আমার ছবি ভাল হয়ে!

মনে হলো যেন রেগে গিয়েছে মিলা আজ। কারণটা ভেবে পেলুম না ঠিক। ছাদে উঠে বললুম, দেখো রেগে আছ আমার ওপর বুঝতেই পারছি। তবু ছবি তোলার সময়ে অন্তত মুখখানাতে হাসি আনো একটুখানি, নইলে গোমড়ামুখ উঠলে শেষে আমায় দুষোনা যেন।

ধমক দিয়ে ও বললে, আবার মাস্টারি শুরু হয়ে গেল? কি করতে হবে না হবে কিচ্ছু বলে দিতে হবে না তোমায়!

সত্যিই বলে দেবার ছিলনা কিছু। বুঝলুম দুদিন পরে, প্রিন্টগুলো যখন হাতে এলো। মুখশ্রী ওর এমনিতেই ভাল তবে ক্যামেরায় তো

সব মুখ সমান উৎরোয়না, ওর যাকে বলে ফটোজেনিক ফেস। ফলে, অতগুলো ছবির মধ্যে ওর দুখানাই হয়েছে সুপার্ব!

রাঙা বৌদির ছবি কখানাতেও খুঁত কিছুই নেই, শুধু কেমন যেন কৃত্রিম ভাব একটা জড়িয়ে রয়েছে, এড়ানো যায়নি কিছুতেই। ওঁর অমন গালে টোল-পড়া হাসিটি পর্যন্ত নকল মনে হচ্ছে। ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেই বড় বেশি সচেতন হয়ে ওঠেন বৌদি, ঐটেই একমাত্র দোষ।

অনীশবাবু বাধা দিলেন। রাঙা বৌদির কথা রেখে শর্মিলার কথা বলুন আপনার। ব্যক্তিত্ব বেশি থাকলে তার সবচেয়ে বড় মুদ্রাদোষই হলো অনুসঙ্গী আত্ম-সচেতনা।

—তাই কি? খবরের কাগজে আমাদের নেতাদের ছবি দেখুন, যাঁর ব্যক্তিত্বের খ্যাতি যত সুদূরপ্রসারি হাসিটিও তাঁর তত বেশি অমায়িক। নয় কি?

অনীশবাবু মন্তব্য করলেন, তাঁরা শুধু তো নেতা নন, সেই সঙ্গে অভিনেতাও যে!…কিন্তু ওকথা থাক শর্মিলার রূপ বর্ণনা করছিলেন আপনি,—

—উঁহু, বর্ণনা করিনি তো, সামান্য একটু উল্লেখ করছিলুম কেবল। …বুঝেছি, ফাঁকি দিয়ে শুনে নিতে চান, সেটি হচ্ছেনা! আর তাছাড়া বর্ণনার বস্তুই নয় সে, রূপ হচ্ছে দর্শনের। অবশ্য সামনে এলে!

—আর, আড়ালে গেলে?

হেসে বললুম, তখন শুধু ধ্যানের বস্তু!…কি জানেন, শুধু বিশেষ জনের চোখেই বিশেষ জনের রূপ বিশিষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। সংস্কৃত কবির উপমা টেনে আমি যদি বলি চাঁদের থেকে নখের আঁচড়ে অমিয়া তুলে তুলে আমার প্রিয়াকে গড়েছিলেন বিধাতা, আর সেই থেকেই

চাঁদের গায়ে কালো কলঙ্ক দাগ, আপনি কি তা মেনে নেবেন হেসে বলবেন ক্যাপামি!

প্রথম ছবি তোলার তিন কি চার দিন পরের কথা। ফিলসফির একজন বিদেশী অধ্যাপক অবসর নিচ্ছেন। তাঁর ফেয়ারওয়েল উপলক্ষ্যে একটা পিরিয়ড হয়েই ছুটি হয়ে গেল সেদিন।

মেয়েদের কমনরুমের সামনে দেখি দাঁড়িয়ে আছে মিলা।

বললুম, ভাবছো কি? বাড়ি ফিরে ফুল স্পিডে পাখা খুলে কখন একটা টানা ঘুম দেবে? সেটি হচ্ছেনা। বিকল্পে আমার একটি প্রস্তাব আছে, শোনো তো বলি।

চোখের তারায় সম্মতির ইসারা পেয়ে বললুম, সেদিন তোমার ছবি মোটেই তোলা গেলনা। চলো আজ কোথাও গিয়ে গাদা-খানেক ছবি তুলে আসি। দুটো রোল রয়েছে আমার কাছে, সব শুধু তোমার।

—উঁহু, আমার দ্বারা হবেনা। দুরোল ফিল্ম মানে বোলোখানা ছবি। তোমার তোলা তো, প্রতিবার দশ মিনিট করে মহড়া,—এদিকে ফেরো, ওদিকে চেয়োনা, মুখ উঁচু করো, ফিক করে হাসো;—সারা গায়ের ব্যথা মরতে তিন দিন লাগবে আমার।

—বেশ, একটি কথাও বলবোনা আমি, তোমার যেমন ইচ্ছে, যে ভঙ্গিতে ইচ্ছে দাঁড়িও।

—কোথায় গিয়ে তোলা হবে শুনি?

—যেখানে হয়। একটু অপেক্ষা করো, হস্টেল থেকে ক্যামেরাটা আনি আমি।

রুদ্ধশ্বাসে ছুটলুম।···ফিরলুম দেখি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আর একটি মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে ও। আমায় দেখে এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করলো। গিয়ে মোড়ে রেস্টুরেণ্টটার সামনে দাঁড়ালুম।

একটু পরেই এলো ও।

—এত দেরি যে?

—কি করি, ওই যাকে দেখলে আমার সঙ্গে, ওর নাম লতিকা চক্রবর্তী, গতবার মেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে! ওদের বাড়ি যাবার জন্যে ধরেছিল আমায়,—

—চুলোয় যাক লতিকা। এসো এখন বাসে উঠি আগে।

—বাসে মানে? মতলব ভাল ঠেকছে না তোমার, বাড়িতে বকুনি খাওয়াবে নাকি? কোথা যাবে বলো আগে?

—কাছাকাছি নিরিবিলি একটা জায়গার খবর জানা আছে আমার। ভাল লাগবে দেখো!

—কতদূর শুনি?

—দক্ষিণেশ্বর।

—ওরে বাবা, এই তোমার কাছাকাছি? আমি ভেবেছিলুম কোন পার্কে-টার্কে হবে বুঝি!

ঘড়িটা দেখিয়ে জবাব দিলুম,—এই সাড়ে এগারোটা মোটে! যেতে এক ঘণ্টা আসতে এক ঘণ্টা, দুঘণ্টাও থাকি যদি ওখানে, চারটের মধ্যে বাড়ি ফিরবে তুমি।

—বৌদি জিজ্ঞেস করলে?

—বয়ে গেছে বৌদির। তিনি কি করে জানবেন কে প্রফেসর বিলেত চললো, কটায় কলেজ-ছুটি হলো? ভাববেন যথা সময়ে ছুটি হয়েছে, ফিরেছো।

—এই কিন্তু শেষ। কাল থেকে আর মিশবোনা তোমার সঙ্গে।

—হেতু জানতে পারি?

—মিথ্যে বলতে শেখাও তুমি।

—বারে, মিথ্যেটা বলতে শেখানো হলো কখন? আমি তো শুধু সত্যটাকে গোপন রাখতে বললুম।

হেসে ফেললে মিলা। বললে, হুঁ, দুটো বুঝি একেবারে আলাদা কথা হলো?

তর্ক করতে করতে উঠলুম তো বাসে। ওখানে নেমে কিন্তু কথাটি নেই মেয়ের মুখে। বাস্তবিক, ভিন্ন একটা রূপ ছিল তখন দক্ষিণেশ্বরের। অধুনা জনসমাবেশে ভিড়ে কালিঘাটের প্রায় গলাগলি যায় দক্ষিণেশ্বর। বছর অন্তর কলি-বালি পড়ে, দোকান-পশার বাড়ে, দুধারি ঝকঝকে গাড়ির লম্বা সারি দাঁড়ায়,—তখন তো আর তা ছিল না! ছুটির দিনে যদিও বা দু-একখানা গাড়ি এলো কলকাতা থেকে, লোকজন জমলো অল্প-সল্প, অন্যদিন কিন্তু একেবারে ফাঁকাই বলতে গেলে।···সামনে ঢুকতেই ভাঙা সিংদরজা। একটু এগোলে টিম-টিম করছে খান দুই খেলামালি পুতুল-পটের দোকান। এধারে হেলে পড়া নবৎখানা, পশ্চিমে শ্যাওলা-পড়া সারিবদ্ধ শিব মন্দিরের চূড়া, সবার মাথা ছাড়িয়ে ভবতারিণীর মন্দির। তারপরে দু-পা আর এগুলেই হঠাৎ মুখোমুখি সুরধুনী গঙ্গা, বয়ে চলেছেন একূলে ওকূলে কুলু কুলু স্রোতে।···আজকের দক্ষিণেশ্বরে চাকচিক্য অনেক বেড়েছে। স্টেট বাসের কৃপায় যাতায়াত সহজ হয়েছে, যাত্রীদের সংখ্যাও শীর্ষমুখী,—সবই মানি। কিন্তু সেই যে একটি সহজ আনন্দের আমেজ লাগতো মনে, ঝড়ঝড়ে বাসে চড়ে কলকাতা থেকে এই ক-মাইল উত্তরে এসেই অবাক হয়ে মনে হওয়া যেন

অনেক অতীত পেরিয়ে মহাকাব্যের কোন্ মহাতীর্থের মাটি ছুঁলুম, তেমনটি আর নেই।

ভরা দুপুর। সকাল থেকে তবু মেঘলা ছিল আকাশ। এখন রোদে কাঠ ফাটছে চতুর্দিকে।—এধার ওধার ছায়ায় ছায়ায় ঘুরলুম বহুক্ষণ, ফিল্মের রোল দুটোও শেষ করলুম দুজনে। তারপর ভেতরে ঢুকে ঠাকুর যে ঘরে থাকতেন তার পূবের লম্বা বারান্দায় নিরিবিলি এক কোণে বসলুম।

একটু একটু করে সূর্য পশ্চিমে গঙ্গা পার হলো। দ্বাদশ শিব-মন্দিরের দ্বাদশটি ছায়া-চূড়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে হতে ভবতারিণীর মন্দিরের দিকে হেলতে লাগলো! লোকজন জমতে শুরু হলো একটি দুটি করে, বেহালা নিয়ে গায়ক একজন সুর বাঁধতে বসলো প্রাঙ্গণের এক ধারে।

মন্দির খুলেছে একটু আগে। বিকেলের আলোয় দেবীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম, ভেতরে ঢুকে প্রণাম করলুম দুজনে। শান্তদর্শন পুরোহিত দুজনের হাতে কয়েক বিন্দু করে চরণামৃত দিলেন, সেইসঙ্গে শাল পাতার টুকরোয় অল্প একটুখানি সিঁদুর।

চুপি চুপি মিলা বললে, দেখলে তো মিথ্যে বলার দোষ? যদি বলে আসতুম বাড়িতে সিঁদুরটুকু নিয়ে গিয়ে বৌদিকে দিতে পারতুম, ঠাকুরের সিঁদুর পেলে কত খুশি হতেন।...

ফিরতি পথে বাসে উঠে সারাক্ষণ মনে হতে লাগলো ছোট্ট একরত্তি দুপুরে এতখানি দুর্লভ আনন্দ ধরে, কই আগে তো জানিনি!

জোয়ারের জলে অনুকূল হাওয়ায় পাল-তোলা নৌকোর মতো এমনি করে দুজনের দিনগুলো হেসে-ভেসে চললো॥

ইতিমধ্যে ছবি তুলে গিয়েছি পাইকেরি হারে। শেষের দিকে প্রিণ্টগুলো করিয়েছি খোদ কোডাকের দোকান থেকে এবং একদিন ম্যানেজারের প্রশংসার পিঠ-চাপাড়ি পেয়ে রীতিমতো দুঃসাহসী হয়ে বাছা বাছা খান কয় ছবি পাঠিয়ে দিয়েছি বিদেশের কটি নাম করা কাগজে, আশা যদি ছাপে ওরা।...অবশ্যই মিলার অগোচরে।

পূজো এসে গেল দেখতে দেখতে। ছুটির কদিন আগে ফিরছি কলেজ থেকে। মিলা বললে, কাল থেকে তোমায় অন্যমনস্ক দেখছি খুব, কেন বলতো ?

—তোমার আমার কথাই ভাবছি! কদিন পরেই বাড়ি ফিরবে। হাওড়ার প্ল্যাটফর্মও ছাড়বে, এখানকার সব কথাও মন থেকে ধুয়ে মুছে সাফ।.. আমি এই একটা মাস কেমন করে কাটাবো ভাবতে পারো ?

—কেন, লক্ষ্মী ছেলেরা যেমন করে কাটায়! সকালে দুপুরে রাত্রে ঘাড় নিচু করে এক মনে পড়াশুনো করবে, বিকেলে এক ঘণ্টা খেলা ধূলো আড্ডা।...খুব খেটে পোড়ো কিন্তু ছুটিটা জানো ? খুলেই টেস্ট। ...আমিই যত নষ্টের গোড়া তা জানি, তবু বলছি মুখটা রেখো আমার। ...বুঝলে ?

—থাক, আমার ভাবনা না করলেও চলবে তোমার!

—ও! আচ্ছা বেশ!

—অমনি রাগ হয়ে গেল তো ?

—মোটেই না। আমি রাগ করবার কে ?

—কে তা কে জানে, তবে তুমি রেগে গেলে ভারি ভয় করে কিন্তু আমার। আর ছোট ছোট বিষয়েও এত রাগ করতে পারো তুমি!

প্রথম যেদিন ছবি তুলতে যাই তোমাদের বাড়ি, বৌদির ছবি আগে তুলেছিলুম বলে মেয়ের সেকী রাগ!

ভ্রূ কুঁচকে বললে মিলা, রাগের কথাই ওঠে না এর মধ্যে। যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বোলো না, জানো!

—সব বুঝি আমি। সব জানি।

—কচু জানো।··জেনেও কাজ নেই আর। দেখো ওপরের বারান্দায় কে দাঁড়িয়ে। আজ আর পালাবে কি করে?

দেখি কথা কইতে কইতে একেবারে ওদের বাড়ির সামনে পৌঁছে গিয়েছি, খোকনকে নিয়ে বৌদি ওপরে দাঁড়িয়ে। হেসে হাত নাড়লুম।

ফিস্ ফিস্ করে মিলা শুধোলে, কি বলবে বৌদিকে?

—বলবো আবার কি! একসঙ্গে ছুটি হতে নেই কোনদিন দু-জনের? তারপর গল্প করতে করতে চলে এসেছি।

—খুব যে সাহস দেখি আজ, এতদিন ছিল কোথা?

ঢুকলুম বাড়ির ভেতরে।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে মিলা বললে, আচ্ছা সবজান্তা মশাই, তুমি তো বললে সব বোঝো, সব জানো। বলো দেখি, আমাদের ফ্ল্যাটে পৌঁছুতে কটা সিঁড়ি ভাঙতে হবে মোট?

—দূর, ও কি একটা জানার মতো বিষয় নাকি? তা-ছাড়া এ পথটা যে আমি লিফ্‌টে চেপে উঠি রোজ, সিঁড়ির ধাপের খবর রাখবো কি করে?

—লিফ্‌টে ওঠো?

—হ্যাঁ, আমার মনের লিফ্‌টে উঠি। মনো-রথ হতে পারে মনো-লিফ্‌ট হতে পারে না?

—বাজে কথা খালি। পারবে না তাই বলো।...আচ্ছা বেশ, তবু আন্দাজটা একবার দেখি তোমার।

—আন্দাজ? ধরো কুড়ি।

—ধেৎ! শুধু দোতলা উঠতেই তো লাগবে কুড়িটা ধাপ। তোমার কুড়িকে তিন দিয়ে গুণ করো, তিন কুড়ি ষাট, বুঝলে?

উঁহু, হতেই পারে না। সে লাগবে তোমার আর সেই সঙ্গে তাবৎ মেয়েদের, যারা স্যাণ্ডাল-পায়ে আঁচল লুটিয়ে একটি একটি করে ধাপ উঠবে।...আমি উঠি এক একবারে তিনটে করে সিঁড়ি। সুতরাং তোমার ওই ষাটকে ভাগ করতে হবে তিন দিয়ে। কত থাকে শুনি?

—শুধু, কথার ভটচায্যি!

—ও! কাজেই দেখো তবে, এই উঠলুম আমি ওপরে।

—এই,—থামো থামো।...আচ্ছা যাও।...যে আগে যায়!

ক-ধাপ উঠে নেমে এলুম আবার। বললুম, বাজে কথা রেখে শোনো দরকারি কথা আছে একটা।

—সেরেছে! তোমার আবার দরকারি কথা! ক্লাশ পালাতে হবে তো?

—একটি দিন আর। সামনের হপ্তাতেই তো চলে যাচ্ছো তুমি।... তা-ছাড়া ক্লাশও পালাতে হবে না। আজ নোটিশ টাঙানো ছিল দেখোনি, ফার্স্ট ইয়ারের কাচ্চা-বাচ্ছাদের বেঙ্গল কেমিক্যালের কারখানা দেখাতে নিয়ে যাবে। বৌদিকে বলবে তুমিও নাম দিয়েছ দলে।

—রাজি না হলে?

—আমিও তদ্বির করবো খানিক!

—বেশ, সেকেণ্ড ইয়ারের বুড়ো ধাড়ি যদি দক্ষিণেশ্বর যায়, রাজি আছি।

—দক্ষিণেশ্বর না, চলো কাল বটানিকস যাই বরং। মুগ্ধ হয়ে যাবে তুমি।…আসা যাওয়ার পথটাই কি কম রোমান্টিক?… গঙ্গার ওপর দিয়ে, স্টিমারে।

চোখ ছুটো উজ্জ্বল করে মিলা বললে, স্টিমারে? সত্যি? সে ভারি চমৎকার হবে কিন্তু!

জবাব দিলুম, হাঁ, এ আর তোমার পাটনার গঙ্গা নয়, যে অর্ধেক শুধু বালি আর চড়ায় ঢাকা!

ফিরে দাঁড়িয়ে বেণী ছুলিয়ে বললে মিলা, কি বললে, পাটনার গঙ্গায় শুধু বালি আর চড়া?

—উঁহু, না তো! কে বললে? থৈ থৈ করছে জল।…চলো এখন তাড়াতাড়ি উঠি। বৌদি ভাবছেন আমরা বুঝি বা ছেনি-বসোলি নিয়েই সিঁড়ি ভাঙতে লেগেছি।

পরের দিন শনিবার।

হাইকোর্টের ট্রামে চেপে ইডেন গার্ডেনসের ওধারে গিয়ে নামলুম। ঘাটে গিয়ে শুনি সেইমাত্র ছেড়ে গিয়েছে একখানা স্টিমার। পরেরটা দেড় ঘণ্টা পরে।

গোড়াতেই বাধা পড়লে কার ভাল লাগে?

বললুম, চলো নৌকোয় পার হই! আশ্বিনের গঙ্গা দেখে ভয়ে রাজি হলো না মিলা।

অগত্যা বাসে উঠে হাওড়া শিবপুর ঘুরতে ঘুরতে পৌছলুম প্রায় ছুটোয়।

বাসে মিলা বললে, গম্ভীর হয়ে গেলে যে অত? নৌকোয় উঠিনি বলে রাগ হলো?

—না রাগ না। মনটা মুষড়ে পড়ছে এমনিই। ভয় হচ্ছে। ব্রাউনিঙের 'দি লাষ্ট রাইড টুগেদার' কবিতাটা বার বার ছায়া ফেলছে মনে।...মিলা এই আমাদের একসঙ্গে শেষ বেড়ানো নয় তো?

—তোমায় মতো সেন্টিমেন্টাল ছুটো যদি দেখে থাকি আমি। যাচ্ছি তো মোটে এক মাসের জন্যে, দেখবে, দেখতে দেখতে, কেটে যাবে!

—বুঝি তো সবই। কিন্তু মন যে অন্য কথা বলে।

—বড্ড বেশি বাজে বকে তোমার মন। চুপ করে খানিক বোসো দেখি।...ঐ দেখো, সামনের পুকুরটাতে কি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মোষ সব নেমে চান করছে।...

আমি হাসলুম।—ভোলাচ্ছ বুঝি?

বটানিকসে নেমে কিন্তু অজান্তেই মুছে গেল যত চিন্তা-ভাবনা। সারাটা দিন হৈ-হল্লা করে কাটালুম দুজনে।

সব চেয়ে বড় কথা, সেদিনের বেড়ানো নিয়ে একটা গোটা বারো লাইনের কবিতাই লিখে ফেললে মিলা। সোমবার ওর রাফখাতা থেকে আবিষ্কার করলুম সেখানা, মুখস্থ করলুম চেঁচিয়ে। কবিতা হিসেবে যদিও উৎরোয়নি সে রচনা, ছন্দ মিলের ভুল প্রতি পদে, তবু শোনাই আপনাকে, কারণ সেদিনের ধারা-বিবরণী হিসেবে আলাদা মূল্য রয়েছে এটির।—

ঝিলমিল আলো দোলে ছায়ার চামরে,
ভাবনা হারানো মনে, উধাও প্রহরে।
টুকরো গানের কলি, কথা, চপলতা,
তারও পরে চকিতের লাজ মৌনতা,—

হিজিবিজি আঁকি-জুকি ঘাসের চাদরে,
হৃদি মৌচাক বুঝি উপচিয়ে ভরে।

তবু তো সময় সরে, রোদে রঙ ঝরে,
শতায়ু বটের কাক-চিল ফেরে ঘরে,
ফেরিঘাটে ভিড় বাড়ে, ঘণ্টা মেলায়,
স্টিমারে নোঙর ওঠে, তীর ছায়া প্রায়।...

আমরা দুটিতে চুপ ডেকে একধারে
কি খুশির ঢেউ ভাঙে এপারে ওপারে।

শেষ অবধি কিন্তু দুজনে চুপটি করে দাঁড়িয়ে খুশির ঢেউ গোনা আর হয়ে উঠলো না আমাদের। কলকাতার ভিতরে পৌঁছে গিয়েছে স্টিমার। বন্দরে নোঙর ফেলা নানান দেশের নিশান তোলা ছোট-বড় জাহাজগুলির দীর্ঘ সারি একটির পর একটি পেরিয়ে আউটরাম জেটির সদ্য-জ্বালা আলোমালা চোখে পড়েছে সবে। মিলা বললে, বাঁদিকে দেখো এক ভদ্রলোক নিবিষ্ট হয়ে লক্ষ্য করছেন তোমায় বহুক্ষণ থেকে।

ফিরে দেখি সর্ট্স পরা হৃষ্টপুষ্ট এক ব্যক্তি একটু দূরে বসে আমার দিকেই চেয়ে চেয়ে দেখছেন। পরিচিত মনে হলো মুখখানা অথচ কোথায় যে দেখেছি আগে স্মরণে এলোনা কিছুতে।

চোখাচোখি হতে দুহাত তুলে নমস্কার করলেন ভদ্রলোক। মিলার দিকে একবার বক্র দৃষ্টিপাত করে বললেন, খবর ভালো সুনন্দনবাবু? এদিকে বেড়াতে এসেছিলেন,...কলেজ বন্ধ বুঝি ?

প্রতি নমস্কার করে হাঁ-না'য়ের মাঝামাঝি গোছের ঘাড় নেড়ে সেই যে মুখ ফেরালুম, আর তাকালুম না ওদিকে ।

মিলা প্রশ্ন করলে লোকটা কে নন্দন ?

—কি জানি, চেনা গেল না ঠিক।

—বৌদির মুখের আদল আসে, না ?

চমকে উঠলুম। তাইতো, খেয়ালই হয়নি এতক্ষণ ও যে রাঙা-বৌদিরই বড় ভাই। ভাই-দ্বিতীয়ার দিন পরিচয় হয়েছিল গত বছরে। সেদিনের গরদের পাঞ্জাবি-ধুতি আর আজকের সর্ট্ সে, তফাৎ অনেক, চিনতে পারিনি ঠিক।

বললুম, সেরেছে। ঠিকই ধরেছো মিলা, রাঙা-বৌদিরই দাদা উনি। শিবপুরে কোন্ জুট মিলে কাজ করেন শুনেছিলুম, হয়তো স্টিমারেই ফেরেন প্রত্যহ।

—বৌদিকে গিয়ে জানাবে'খন। কলেজ ফাঁকি দিয়ে একটা মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছ, অপরাধ সামান্য নয় তো !

—আমার কথা নয়, ভাবছি তোমারই বেশি মুস্কিল !

—মুস্কিল কিসের ? আমাকে তো আর চেনেন না উনি ! গত তিন মাসে একদিনও দেখিনি ওঁকে আমাদের বাড়ি।

—দেখনি, এবার দেখবে। হয়তো কালই গিয়ে হাজির হবেন।

—যান না। আমি সামনে বেরুলে তো !

ইতিমধ্যে সোমবার আর এক কাণ্ড ঘটে গেল।

সকাল থেকে মাটির এক বিঘত উঁচু দিয়ে হাঁটছি। মানে, সেই-দিনই কলেজে কাড়াকাড়ি করে ওর সেই কবিতাটা আবিষ্কার করেছি কিনা ! আমার যে কথা শুনে বটানিকেলে তার দুদিন আগে লজ্জায় মুখ নিচু করে বসে বসে শুধু দুর্বা ছিঁড়েছে মিলা, তারই জবাব লিখেছে ওর খাতায়—হৃদি মৌচাক বুঝি উপচিয়ে ভরে।...

বিকেলে কোডাকের দোকান থেকে প্রিন্টগুলো নিয়ে ফিরছি। পার্ক স্ট্রীটের ঠিক মোড়ে রাঙাদার সঙ্গে দেখা।

বললেন, হাতে ওসব কি নিয়ে চলেছিস, আবার কারো ছবি তুললি বুঝি? দিনকতক করে কি যে এক একটা নেশায় পায় তোকে!

মনে হলো ছবিগুলো রাঙাদাকে দেখানোই উচিত। বৌদির সেই হৃষ্টপুষ্ট ভাই ওঁদের ওখানে গিয়ে হানা দেবার আগেই সব কথা বলে রাখা ভাল।...তাছাড়া ভেবে দেখলুম, লুকোচুরিতে লাভও নেই আর।

বললুম, একটা বিষয় তোমায় বলবো রাঙাদা, শুনে কিন্তু রাগ করতে পাবে না।

বিস্ময়ের সুরে রাঙাদা বললেন, কি কথা রে?

ভয়ে ভয়ে বললুম, কথা আর বিশেষ কিছুই নয়, পরশু শর্মিলা কলেজে পৌঁছুতে দেরি হওয়ায় ওদের দলবল বেঙ্গল কেমিক্যাল দেখতে আগেই চলে গিয়েছিল। মন খারাপ করে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল বেচারি, তাই ডেকে নিয়ে দুজনে বটানিকসে বেড়াতে গিয়েছিলুম। দেখো, কি সুন্দর সুন্দর ছবি তুলেছি!

রাঙাদা একটু গম্ভীর হলেন,—সামনে তোর পরীক্ষা, যাকে বলে শিরে সংক্রান্তি, আর তুই এইসব বাজে কাজে সময় নষ্ট করছিস এই সময়?

বুঝলুম স্পষ্টাস্পষ্টি বোঝাপড়া হয়ে যাওয়াই ভাল। চৌরঙ্গীর পূবের ফুটপাথ ধরে হাঁটছি দুজনে। ওঁর হাতের মধ্যে হাতখানা গুঁজে দিয়ে বললুম, তোমার সঙ্গে আমার নিজের দাদার প্রভেদ দেখিনি কোনদিন। একটা কথা বলছি, মন দিয়ে শোনো রাঙাদা। আর যাই করো নির্লজ্জ ভেবোনা আমায়। ...

র্মিলার আর আমার তিন মাসের এই বন্ধুত্বের কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করে গেলুম। বললুম, পড়াশোনা আমি মনযোগ দিয়েই করছি, করেও যাবো। পড়ার ব্যাপারে ঝোঁক আমার আগের চেয়ে বেড়েইছে বরং, কম তো নয়ই। তবে ছাত্রজীবনও তো আর চিরন্তন নয়, ক-বছর পরে শেষ হবেই।…তখন কিন্তু শর্মিলাকে বিয়ে করতে চাইবো আমি, আগে থেকে জানিয়ে রাখলুম, শেষে যেন অমত কোরো না।

—ছেলেমানুষি রেখে রাস্তাটা ক্রশ কর্ দেখি, ডবল ডেকার আসছে একখানা।

রেগে গিয়ে বললুম, মোটেই তুমি কান দিচ্ছ না আমার কথায়, আমি কিন্তু খুব সিরিয়াসলি বলছি।

—তাইতো ভাবছি, হঠাৎ এত লায়েক হয়ে উঠলি কবে থেকে? মাসিমা শুনলে কি ভাববেন বলতো?

বললুম, আমার মায়ের কথা বলছো? জানোই তো, আমার কোন কিছুতে না করেন না মা, আর মা রাজি হওয়া মানেই বাবাও রাজি।…তাছাড়া শর্মিলাকে মা যে ভালবাসেন খুব। তোমাকেও বাসেন। তোমাদের বাড়ির সব্বাইকে!

রাঙাদা নীরব রইলেন।

—কথা বলছো না যে? আমি কিন্তু জবাব না নিয়ে ছাড়বোনা। জিনিসটার গুরুত্ব তুমি বুঝতে পারছোনা ঠিক,—বৌদি হলে বুঝতেন।

এতক্ষণে ঠোঁটের ফাঁকে হাসি এলো রাঙাদার। বললেন, বুঝেছি সবই। বৌদিই আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটি খেয়েছেন তোমার।…শোন্, তোর প্রস্তাবে রাজি হতে আপত্তি নেই আমার যদি একটা সর্ত মেনে চলবি কথা দিস!

—বলো কি সর্ত?

—আজ থেকে পুরো দুমাস শর্মির সঙ্গে তুই দেখা করতে পারবিনা মোটে। ছবি-টবি তোলা বন্ধ, পড়াতেও হবেনা আর ওকে। দুটি মাস অর্থাৎ একত্রিশ আর ত্রিশে একষট্টি দিনের অদর্শনের পরেও যদি অচ্যুত থাকে তোর সংকল্প তখন প্রতিশ্রুতি দেবো আমি।

—বেশ তাই হবে। একমাস তো এমনিতেই দেখা হবে না, চলে যাচ্ছে ও পরের সপ্তায়।

—হ্যাঁ, এই একমাস আর তার পরে আরও একমাস। চিঠিপত্র লেখাও বন্ধ কিন্তু!···রাজি?

—রাজি! জেণ্টলমেন্‌স এগ্রিমেণ্ট!···তবে হ্যাঁ, কালকে একবারটি শেষ দেখা সেরে নেবো কিন্তু! অমত নেই তো?

পরের দিন কলেজ এলো মিলা, মুখে শ্রাবণের ঘনছায়া।

বললে, দাদাকে কাল কি বলেছো তুমি?

—সব!

—দাদা ফিরে বৌদিকে বলেছেন, বৌদি শুনে ফিউরিয়স। সে মূর্তি কল্পনাই করতে পারোনা তুমি। আমাকে ডেকে একচোট বকুনি। তারপর বললেন, ভেবেছ কি নন্দন ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবে? আমি থাকতে ওসব নষ্টামি চলতে দেবোনা এ বাড়িতে।···শোনো, আমি পাটনা যাবার আগে তুমি এখন যেওনা ওখানে আর। কেমন?

বৌদির ওপরে অচল বিশ্বাস আমার। জোর দিয়ে বললুম, কি যে বলো তুমি, বৌদি আমাকে ভুল বুঝবেন, এ হতেই পারেনা। রাঙাদা হয়তো ব্যাপারটা বলতে পারেননি গুছিয়ে। আমি একবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই দেখবে বৌদি গলে জল একেবারে।

বাধা দিয়ে মিলা বললে, দেখ তর্ক করে লাভ নেই, করতে চাইও না আমি। শুধু এইটুকু জেনে রাখো মেয়েরাই মেয়েদের আগে চেনে।... আমার কথা শোনো, কদিন এখন যেয়োনা আমাদের বাড়ি। একটা লজ্জার ব্যাপার হলে সে আমি সইতে পারবোনা কিন্তু !

ওর চোখে জলের আভাস দেখে বিস্মিত হলুম।

অথচ কি যে ঝোঁক চাপলো, সেইদিনই সন্ধ্যায় হাজির হলুম গিয়ে ওদের বাসায়।

কলিং বেল টিপতেই চাকরটা দরজা খুলে দিলে। দিয়ে নিচে নেমে চলে গেল।

প্রথমেই দেখা পেলুম বৌদির। খোকনকে কোলে নিয়ে পাখির দাঁড়ের কাছে দাঁড়িয়ে ছোলা দিচ্ছেন।

বললুম. খবর সব ভাল বৌদি ?

বৌদি জবাব দিলেন না।

বুঝলুম আবহাওয়া অনুকূল নয়। চুপ করে দাঁড়িয়ে গেলুম !

সামনেই বসবার ঘরের দরজা। রাঙাদা বেরিয়ে এলেন,—এই যে নন্দন আয়, তোর জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম।

—তাই নাকি ? সামনের চেয়ারখানা ঘুরিয়ে নিয়ে বসলুম আমি।

রাঙাদা একটা সিগ্রেট ধরাবার চেষ্টা করে পর পর তিনবার বিফল হলেন। তিনটি কাঠিই নিভে গেল যথাস্থানে অগ্নিস্পর্শের আগেই।

—দাও দেশলাইটা, আমি ধরিয়ে দিই।

—থাক, এখন আর খেতে ইচ্ছে করছেনা। গোটা সিগ্রেটটি নিয়ে এ্যাসট্রের মধ্যে আঙুল পুরে গুঁজে দিলেন রাঙাদা। খুবই উত্তেজিত হয়ে রয়েছেন মনে হলো।

অতঃপর পিছনে দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে খুব সম্ভব বৌদির দিকে একবার দেখে নিলেন রাঙাদা। তারপরে ছোটছেলের মুখস্থ বলার ভঙ্গিতে একদমে অনেকগুলো কথাই গড় গড় করে বলে গেলেন।...প্রথম বক্তব্য হলো, যে সহজ বিশ্বাসের প্রশ্রয় তথা অকৃত্রিম স্নেহ-ভালবাসার সুযোগ নিয়ে ওঁদের অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলুম আমি, নিজ দোষে খর্ব করেছি তা।...দ্বিতীয়ত, আমার আর শর্মিলার বয়স একেবারে সমান সমান, অবশ্যই এ নিয়ে এমন সব কথা উঠবে আমাদের পরিবারে যা কিনা ওঁদের বাড়ির সম্মানের পরিপন্থী, যথা আমাকে হাতের মধ্যে পেয়ে দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছেন ওঁরা!...তিন নম্বর, কাল সারারাত যথেষ্ট বিচার-বিবেচনার পর বুঝেছেন উনি, আমাদের দুজনের এই যে মাথামাখি, এটা নিছক শিশুসুলভ বোকামির পর্যায়ে পড়ে, কাজেই আপাত—নিষ্ঠুর মনে হলেও, একে অঙ্কুরে বিনাশ করে দেওয়াই হচ্ছে অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। শেষ কথা হলো কালকের দেওয়া সর্তাবলী প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন উনি, যেহেতু কোন পক্ষেরই অভিভাবক উনি নিজে নন।

জেন্টলমেন্‌স এগ্রিমেণ্টের এই হলো পরিণতি! পূর্ব দিনের সমস্ত আলোচনা একটিমাত্র নিশ্বাসে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া হলো।...ওঁদের বাড়িতে যাতায়াত করতেও নিষেধ করে দিলেন রাঙাদা এবং বার বার অতীব দুঃখের সঙ্গে জানালেন, সেও শুধু আমার নিজেরই মঙ্গলের জন্যে।

যতক্ষণ উনি বলছিলেন চুপ করে শুনে যাচ্ছিলুম। আমাতে আর ছিলুম না আমি। বলা শেষ হতে যখন মুখ তুলে চাইলুম, সামনের আয়নায় নিজের মূর্তি দেখে নিজেরই ভয় হলো।...তবু, সেই মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যেও রাঙাদার জন্যে করুণা হলো আমার। স্পষ্টই বোঝা

যাচ্ছিল এতক্ষণ ধরে যা বললেন উনি তার একটা বর্ণও নিজের নয় ওঁর, আর একজনের শেখানো কথা পুনরাবৃত্তি মাত্র।

সেই বিশেষ আর একজনটির দিকেও চোখ ছিল আমার। তিনি তখনো একচিত্ত হয়ে পোষা চন্দনার খাওয়ার তদারকে ব্যস্ত। ধারে-কাছে মানুষজন যে আছি কেউ সে বাহ্যজ্ঞানটুকু আছে বলে বোধ হলনা! এই তো সেদিন ঠিক এমনি একটি সকল-ভোলা ভঙ্গি পাবার জন্যে ক্যামেরা নিয়ে কত চেষ্টাই না করেছি, আর আজ এই মুহূর্তে এমন অনায়াসে এ অনন্য ভঙ্গিমা কেমন করে আয়ত্ব করলেন বৌদি? ···মেয়েদের সখ্যতা যেমন অতুলনীয় অনীশবাবু, তাদের শত্রুতাও তেমনি তুলনারহিত জানবেন।···ইচ্ছে হলো শিকল ছিঁড়ে দিই পাখিটাকে উড়িয়ে, কোল থেকে নামিয়ে দিই ছেলেটাকে মাটিতে বসিয়ে। তারপর মুখোমুখি প্রশ্ন করে জেনে নিই এতখানি নির্মম উপেক্ষার অর্থ কি?···প্রবৃত্তি হলো না!

রাঙাদাকে বললুম, যাই তবে?

—আয়।

কি যে দুর্গ্রহ কাঁধে ভর করে এক এক সময়, নির্বুদ্ধিতার চরমে নিয়ে ঠেলে দেয়। বললুম, ওকে একবার ডেকে দেবেন, দেখা করে যাবো?

—কি দরকার আর? রাঙাদার শান্ত জবাব।

এতক্ষণে বৌদির মুখে বাণী বেরুলো,—বলো না, সে বাড়ি নেই।

ওঁর নির্জলা মিথ্যে ভাষণের অবাক সাক্ষী হয়ে মিলার দুজোড়া জুতোই একটু দূরে পাশাপাশি সাজানো।

যেন শুনতেই পাইনি বৌদির কথা, চিৎকার করে ওর নাম ধরে ডাকলুম। গলাটা নিজের কানেই অপরিচিত ঠেকলো।

একবার···।

তুবার···।

পর পর চারবার ডাকলুম, সাড়া নেই। শুধু পাখিটা দাঁড়ে বসে চিৎকার করতে লাগলো সমানে। ও হতচ্ছাড়াও বুঝি যোগ দিয়েছে ষড়যন্ত্রীদের দলে!

হেরে যাওয়া খেলুড়ে বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে দেঁতো-হাসি হেসে করমর্দন করে যেমন বিদায় নেয়, তেমনি একটা কৃত্রিম বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে গট গট করে বেরিয়ে এলুম ঘর থেকে। একদমে ঝড়ের মতো নেমে এলুম সিঁড়ি কাঁপিয়ে।

রাস্তায় নেমে কিন্তু গুলিয়ে গেল সব,—এ কোন্ অচিন শহর, এ কোন্ অজানা পথ! হন হন করে হাঁটতে লাগলুম। বহুক্ষণ পরে খেয়াল হলো এদিকে তো হস্টেল নয় আমার! এ যে একেবারে ভিন্ন দিকে চলেছি!

অনীশবাবু প্রশ্ন করলেন, রাঙা বৌদির সেদিনের সেই বিচিত্র নিষ্ঠুর আচরণের কি অর্থ করলেন আপনি তার পরে?

—আপনার কি বোধ হয়?

—সম্ভবত ওঁর কোন এক স্থির সিদ্ধান্তের ওপরে প্রচণ্ড ঘা দিয়েছিলেন আপনি!

—কি রকম?

—হয়তো বৌদি ভাবতেন ওঁর ওপরে এমনই একটা অদম্য আকর্ষণ ছিল আপনার যা আপনাকে সময়ে-অসময়ে টেনে নিয়ে যেতো ওঁদের বাড়ি। যখন জানলেন আপনার সে তুর্বলতার বৃত্তটি ওঁকে

কেন্দ্রবিন্দু করে নয়, সে স্থান দখল করে আছে অন্ত কেউ, সইতে পারলেন না।

—ছি ছি,এ কি বলছেন আপনি, আমাকে যে উনি ভাই ডাকতেন!

—অস্বীকার করছিনা। আমি তো বলিনি উনি নিজেও আপনার প্রেমে বাঁধা পড়েছিলেন!···কিন্তু নিজে ভাল না বাসলেও ভালবাসা পেতে কে না খুশি হয়? বিশেষ করে মেয়েরা।···আপনার মতো একটি উজ্জ্বল ছেলে কলেজ শুদ্ধ মেয়ের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে শুধু ওঁরই আঁচলের ছায়াটুকুর লোভে ঘুর ঘুর করছেন দিনের পর দিন, এ তো এক রকমের আনন্দের খেলা।

—জানিনা কি বলতে চাইছেন আপনি। আমি কিন্তু ওদিক দিয়ে ভাবিনি কখনো। আমার বিশ্বাস, ঘা দিয়েছিলুম আমি ওঁর সূক্ষ্মাগ্র আত্মমর্যাদার 'পরে। এতখানি কাণ্ড যে ওঁর সম্পূর্ণ আড়ালে-অগোচরে নিঃশব্দে ঘটে গিয়েছে এইটেই কোন মতে মেনে নিতে পারেননি বৌদি। সংশোধন করা যেতো যদি প্রথম আর্জিটা রাঙাদার কাছে পেশ না করে সিধে ওঁর দরবারে গিয়ে হাজির হতে পারতুম। স্থির জানি, উনি তাহলে কোমর বেঁধে উঠে-পড়ে লাগতেন, সাহায্য করতেন দুজনকে!···আশ্চর্য এই যে, সামাজিক, পারিবারিক কিংবা অর্থনীতিক,—সাধারণত যে বাধাগুলো এ ধরণের মিলনকে পণ্ড করে দেয়, তার একটিও ছিলনা আমার আর মিলার ক্ষেত্রে। কেবল এক গর্বি মেয়ের অন্যায় জিদের জন্যই ব্যর্থ হলো সব-কিছু!

শর্মিলার সঙ্গে আর বোঝাপড়া করলেন না তার পরে? অনীশবাবু শুধোলেন।

—কই আর তা সম্ভব হলো! পরের দিন থেকেই কলেজে গরহাজির মিলা, অথচ ছুটি হতে তখনো পাঁচদিন বাকি। এর

মাঝখানেই বাবার একখানা চিঠিতে কিছু অম্ল-মধুর উপদেশ বর্ষিত হলো। বোঝা গেল পাটনা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে রটনা। রাঙা বৌদির কাজের ধারাই এই রকম,—একেবারে নিখুঁতভাবে প্ল্যান করা,—আমার পাটনা যাবার পথটাই বন্ধ করে দিলেন দিন কতকের মতো।... রাঙাদার সঙ্গে একদিন দেখা শ্যামপুকুরের পুজো-প্যাণ্ডেলে, চিনতেই চাইলেন না।

...ছুটির পর কলেজ খুললো। মিলা অনুপস্থিত। খবর পেলুম, সে তখন পাটনার উইমেন্‌স কলেজে ক্লাশ করছে নিয়মিতভাবে।

—এখানেই শেষ ?

—প্রায়। একটা দৃশ্য বাকি!

ফেব্রুয়ারির শেষ।

সবে দিন দুই পরীক্ষা চুকেছে। জিনিসপত্র টুকিটাকি এটা-সেটা কিনছি, প্রায় আট মাস পরে বাড়ি ফিরবো। বাবা-মাকে দেখবো কতদিন পরে। মিলার সঙ্গেও দেখা হবে, হয়তো শুভ পরিণতিও হবে তার ফলে, এমন আশাও হচ্ছিল!

ভাবি এক, হয় আর! যে রোববার যাবার কথা তার আগের দিন বিকেলে তার এলো বাবার অসুখ, তখুনি যেন পাটনা ফিরে যাই।

সেই প্রথম টেলিগ্রাম পেলুম জীবনে,—মনের অবস্থা অনুমান করতেই পারেন। ট্রেন রাত দশটায়। তবু সন্ধ্যের পরেই একখানা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

আমার গাড়ি ঠিক হাওড়া স্টেশনের সামনে গিয়ে পৌঁছেচে,—দেখি মস্ত একখানা হুডখোলা ট্যাক্সি বেরিয়ে এলো স্টেশনের গাড়ি বারান্দার

তলা থেকে, ঘুরে কলকাতার দিকে মুখ করলো। এক লহমার জন্যে চোখে পড়লো অনেকগুলি চেনা মুখ, মিলা, ওর বাবা-মা, রাঙাদা।

…সদলবলে সকলে মিলে হঠাৎ কলকাতা এলো কেন বুঝতে পারলুম না।

পাটনা স্টেশনে নেমে দেখি বড় মামা দাঁড়িয়ে। এখানে বলে রাখা ভাল আমার মামাদের বাড়িও পাটনার কাছেই—একটা স্টেশন পরে দানাপুরে।

মামার মুখ দেখে বুঝতে আর কিছু বাকি রইল না আমার। স্যুটকেশ বেডিং এবং আরো যাবতীয় বস্তু সদ্য নামানো হয়েছে প্ল্যাটফর্মে, তারই ওপর হতচেতনের মতো বসে পড়লুম।…

—এখানেই শেষ করুন এ প্রসঙ্গ, করুণ লাগছে,—অনীশবাবুর কণ্ঠস্বর!

…স্মরণের যাদুঘরের দরজা খুলতে খুলতে কোন অন্ধকারে পৌঁছে গিয়েছিলুম। অনীশবাবুর গলায় আলোর ইশারা পেলুম। বললুম, সেই ভাল, কিছু বরং বাদ দিয়ে চলে যাই।

…মাস দুই না যেতেই বোঝা গেল সংসার-তরণী চড়ায় ঠেকতে বেশি দেরি নেই আর। বাবার আয় ছিল যথেষ্ট এইটেই জানতুম, ব্যয়ের খবরটা জানা ছিল না। তাছাড়া, উকিল ডাক্তারদের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স শেষের দিকেই বাড়ে বেশি, বাবার বয়স তখন মোটে সাতচল্লিশ।

দেখা গেল সামান্যই কিছু টাকা পড়ে আছে ওখানকার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে। আর স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে শুধু মা'র নামে আমাদের 'নভোরেণু' বাংলোটি।

দু-মামাই রেলের চাকুরে। গয়া লাইনে গার্ডের একটা পোস্ট খালি

যাচ্ছিল তখন। দুজনে ক্রমান্বয়ে পাখি-পড়া করাতে লাগলেন আমায়, যেন কাজটি হাতছাড়া না করি।

আমার এদিকে রোখ চেপে গিয়েছিল পড়াটা চালিয়ে যেতে হবেই। পরীক্ষার ফল বেরুতে যখন দেখলুম এত অবিশ্রাম ফাঁকি সত্ত্বেও ফার্স্ট ডিভিসনে টপকে গিয়েছি, জিদ গেল বেড়ে। অথচ খুব যে একরোখা টাইপের ছেলে ছিলুম তা তো নয়ই, মামাদের সঙ্গে তার কিছুদিন আগে অবধি চোখ তুলে কথাই বলিনি।...তবে এটা তো জানেন যে, রোগী লোকের রাগ বেশি হয়ে থাকে, দুঃখ বেদনায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে আমারও ভিতরাংশ রীতিমতো অসুস্থতার বিকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল সেই সময়টাতে।...মিলার কথার শেষটুকুও বলে নিই এই সঙ্গে। সেই যে, যে রাত্রে ট্যাক্সিতে দেখে এসেছিলুম ওদের হাওড়া স্টেশনের সামনে, কদিন পরেই খবর মিলেছিল মিলার নাকি বিয়ে, সেই উপলক্ষ্যেই গেছে ওরা।...

আমার সঙ্গে না পেরে মামারা শেষটা মাকে গিয়ে উত্ত্যক্ত করতে শুরু করলেন। মরিয়া হয়ে মাঝে মাঝে প্রবল বাসনা হতো বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাই কোথাও। আবার মনে হতো মাকে ছেড়ে যাই কি করে?

মায়েরা না জানি কেমন করে যেন জানতে পারেন ছেলেদের ভাবনা-বাসনা। একদিন সকালে খেতে বসেছি। মা বললেন, কিছু একটা নিয়ে কদিন ধরে খুব ভাবছিস তুই। যখনই দেখি বুকে হাত রেখে কখনো ঘরে, কখনো বাইরে, কখনো গেটের সামনে রাস্তার ধারে লম্বা লম্বা পা ফেলে পায়চারি করছিস, যেন কার সঙ্গে লড়াই করছিস মনে মনে, ভাবটা এমনি! পালাবার মতলব আঁটছিস না তো?

চমকে উঠে জবাব দিলুম, কই না, ভাবিনি তো কিছু!

মা আমার চোখে চোখে চেয়ে রইলেন অল্পক্ষণ।

সেই দিনই রাত্রে।

জ্যৈষ্ঠের গরমে ঘুম নেই চোখে। ছাতে একটা পাটি পেতে শুয়ে এলো-মেলো আকাশ-পাতাল ভাবছি।

মা এসে দাঁড়ালেন মাথার কাছে,—ঘুমোস্ নি এখনো?…থাক থাক, উঠতে হবে না, আমি তোর মাথার কাছে বসছি।

মার কোলের মধ্যে মাথাটা গুঁজে দিয়ে আরাম করে শুলুম।

একটু পরে মা বললেন, না হয় চলেই যা তুই কোথাও! ওঁর বড় ইচ্ছে ছিল তুই অনেক পড়বি, মস্ত বড় ইঞ্জিনিয়ার হবি।…দাদাদের মুখের ওপর বলতে তো পারি না কিছু, অসময়ে ওঁরাই এখন ভরসা।

—তুমিও যাবে বলো আমার সঙ্গে? এ বাড়ির তবে একটা ভাড়াটে জোগাড় করি?

—দূর বোকা, এ বাড়ির আর কতই বা ভাড়া হবে, তাতে কি কলকাতা গিয়ে থাকা চলে? তাছাড়া, কলকাতা যে যাবো, উঠবো কোথায়? শিবপুরে ভর্তি হলে তুই ওদের হস্টেলেই থাকবি, আমাকে তো আর ঢুকতে দেবে না সেখানে!…দেখ্ না, তোর বাবা ভাইদের থেকে পৃথক হয়ে পাটনা চলে এলেন যখন, তোর জ্যেঠা কাকাদের সে নিয়ে কত ঝগড়া, আমিই নাকি ঘরছাড়া করে নিজের বাপের বাড়ির দেশে ভুলিয়ে নিয়ে এলুম ওঁকে। আর এখন দেখ্, তোর মামাদের এত ইচ্ছে রেলের চাকরিটা নিয়ে এখানেই থিতু হয়ে বসিস তুই, এ সময় যদি কলকাতা চলে যাই, ওঁদের সঙ্গেও আড়ি করে যেতে হয় তবে।…তার চেয়ে একাই যা তুই। আমি বরং দানাপুরে

দাদাদের ওখানে গিয়ে থাকি, বাড়ি ভাড়ার যে টাকাটা পাবো মাস গেলে তুলে দেবো বৌদিদের হাতে, অসম্মানের কিছু থাকবে না।

—কিন্তু মনোমালিন্য সেই তো হবেই পরে। ওঁদের সম্মতি নিয়ে তো আর পাঠাচ্ছো না আমায়!

—আমি পাঠাতে যাবো কেন? যা ভাবছিস তুই কদিন থেকে, তাই কর্ না।

—মানে?

—দরকার মতো টাকা তুলে নে ব্যাঙ্ক থেকে। তারপর একদিন সুযোগ মতো শেষ রাতের গাড়িতে চলে যা কলকাতা।···ঠিকানাটা কেবল জানিয়ে দিস ওখানে পৌঁছে আর প্রতি-মাসে অন্তত একখানা করে চিঠি যেন পাই।···মামাদেরও জানাস কলেজে ভর্তি হবার পরে।

শুনে মনে হলো মজা করছেন মা।

—আর শোন্, গাঢ় গলায় মা বললেন,—কোন কিছু নিয়েই খুব বেশি চিন্তা করে অনর্থক মন খারাপ করবি না। উচিত মতো পড়বি, খেলাধুলো করবি খুব, সব সময়েই একটা না একটা কাজে জড়িয়ে রাখবি নিজেকে।···সব দাগই ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যায় যদি না তাতে অনাবশ্যক খোঁচা পড়ে, বুঝলি?

বুঝলুম! মিলার কথার ইঙ্গিত দিচ্ছেন মা। ওঁর নিজেরও কি তবে কোন কল্পনা ছিল সেই মেয়েটিকে নিয়ে?

—টাকা কিন্তু আমি তুলতে পারবো না মা। এমনিতেই দুর্নামের অন্ত থাকবে না, এর পরে টাকা নিয়ে গেলে সকলে বলবে মাকে ফেলে মায়ের টাকা চুরি করে পালিয়েছে।

দৃঢ়কণ্ঠে মা জবাব দিলেন, বলুক যার যা খুশি। তোর আমার তাতে

বয়েই গেল। একটু শক্ত হতেই হবে এ সময়ে। ওঁর কত স্বপ্ন ছিল সত্যিকারের বড় হবি তুই!…আমার চেষ্টার ত্রুটি রাখবো না, তুই নিজেও কিন্তু খাটিস বাবা! বড়টাতো আগেই ফাঁকি দিলে!…ছাড়, ছাড়…কি পাগলামি করিস্!

আমি মা'র পায়ের আঙুলে ঠোঁট দুটো চেপে ধরেছি।

কলকাতা এসে শিবপুর যাদবপুর কোনখানেই এ্যাডমিশন পেলুম না। যথেষ্ট দেরি হয়ে গিয়েছিল। ভাবলুম আপাতত বি এস্. সি'তে ভর্তি হয়ে যাই।

এক সহপাঠির সঙ্গে দেখা ইতিমধ্যে। শুনলুম, তার দাদার বন্ধু কে এক পার্সি ভদ্রলোকের সঙ্গে মিলে ব্যবসা ফাঁদবার তাল করছে সে। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চা পাকোড়া খাওয়ালে। কাগজে-কলমে ছকে-কষে বুঝিয়ে দিলে কত টাকা ফেললে এক বছরের মধ্যে কত হয়ে ঘুরে আসবে তা। যদি চাই আমাকেও একজন অংশীদার করে নেবার চেষ্টা করতে পারে সে। বললে, বি. এস, সিতে ঢুকে মিথ্যে দুটো বছর নষ্ট করবে কেন? নেমে পড়ো আমাদের সঙ্গে, ভাল না লাগে টাকা তুলে নিয়ে পরের সেশনে শিবপুরে ভর্তি হয়ো না হয়। তবু একটা বছরও তো বাঁচবে।

প্রস্তাব মন্দ লাগলো না। পার্সি ভদ্রলোকটিকেও দেখলুম পরের দিন। তাঁর যুক্তি আরো অকাট্য। সঙ্গে মোট তিনটি হাজার টাকা, পাঁচশো রেখে সবই তুলে দিলাম ওদের হাতে।

…কাজ আরম্ভ হতে আমায় কিন্তু ওরা বাইরে বাইরেই ঘোরাতে লাগলো, অর্ডার সংগ্রহের কাজে। আজ এখানে কাল ওখানে, পূর্ব-বাংলা আসাম বিহারের নগরে-বন্দরে। আমারও তাতে আপত্তি ছিল

না খুব, কারণ এদিকের সব বাঁধনই আলগা হয়ে এসেছিল ততদিনে।
…কলকাতা চলে আসার মাস দুই পরেই মার চিঠিতে একটি মর্মান্তিক দুঃখের খবর পাই। আমি তখন আমিনগাঁওয়ে, চিঠি ঘুরে গিয়ে হাতে পৌঁছুল,—মিলা নেই। বিয়ের পরে পুরো মাস পাঁচেকও হয়নি মায়া-ভালবাসার মাটি ছেড়ে চলে গেছে সে। কি যে ঠিক হয়েছিল তা কিছু লেখেননি মা, শুধু দুঃখ করে চিঠির শেষে লিখেছেন আমি যেন শোক না করি! শোকের চেয়ে বড় শত্রু নেই, শোক ধৈর্য বুদ্ধি কর্মক্ষমতা নষ্ট করে, শোকে মানুষের মন পঙ্গু হয়ে পড়ে। আরও লিখেছিলেন মা, পেয়ে হারানোর মতো দুঃখ নেই, তার চেয়ে না পাওয়া ভাল। কথাটা যেন মনে রাখি আমি।

পিতৃশোকটা গুমরে গুমরে ছিলই ভেতরে, তার ওপর প্রিয়ার শোক,—হয়তো ক্ষেপে যেতুম, বাইরে বাইরে ঘুরতে পেয়ে বেঁচে গেলুম।…শুনেছি শাস্ত্রপাঠে শোকের লাঘব হয়, জানি না। তবে নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করেছি দেশ ভ্রমণে শোকের হ্রাস হয়। মৃতা সতীকে কাঁধে নিয়ে শিব যে ভুবন পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন তার তাৎপর্য বোধ হয় এইখানেই।

বছর ঘুরলো না, ফার্ম আমাদের লালবাতি জ্বাললো এদিকে। বন্ধু নিপাত্তা এবং আমি প্রায় নিঃস্ব। না জেনে অপরকে অত্যধিক বিশ্বাস করার জন্যে হাত কামড়াতে ইচ্ছে হলো। এখন ভাবি বৃথা যায় না কিছুই। সেই এক বছরে কিছু অভিজ্ঞতা অন্তত সঞ্চয় হয়েছিলো তো! পরিচয়ও ঘটেছিল বহুস্থানে বহু জনের সঙ্গে। তাদেরই মধ্যে বাছা বাছা জায়গায় চিঠির তীর ছাড়তে লাগলুম। বিঁধলো গিয়ে চট্টগ্রামের এক ক্লিয়ারিং এজেন্সির মালিকের হৃদয়ে।

মাইনে যদিও সামান্য, ঢুকে পড়লুম চোখ-কান বুজে। মাকে লজ্জায় জানালুম না কিছু, চিঠিপত্র কলকাতার এক পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে গতায়াত করতে লাগলো।

তার পরে পুরো আঠারো বছর কেটে গিয়েছে, অনেক ভেসে ভেসে পায়ের তলায় শক্ত মাটি মিলেছে অবশেষে! ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সম্ভব হয়নি আমার। বাবা মা'র ইচ্ছে মতো বহুজনের মাথা ছাড়িয়ে বিশিষ্ট জনও হতে পারিনি আমি। তবে মাথা হেঁট করার মতো কোন কাজ না করে এগিয়ে চলেছি আজো, এইটেই তাঁদের আশীর্বাদ বলে মেনে নিয়েছি। একই স্থানে একই ধরণের কাজ দীর্ঘদিন ধরে করে চলা— শুধু এইটেই কিছুতে ধাতে সওয়াতে পারলুম না, এই একমাত্র দোষ আমার। প্রকৃতিটাই যেন কেমন যাযাবরের মতো হয়ে গিয়েছে। নইলে একথা স্বীকার করতেই হবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সৎ আচরণ পেয়েছি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছ থেকে। অভিযোগ নেই কারো বিরুদ্ধেই। প্রতিযোগীদের কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন চেহারাটায় নাকি বিশেষ রকম এ্যাপিল আছে আমার, যা আমার সাফল্যের অন্যতম কারণ! জানিনা তা সত্যি কিনা। তবে হ্যাঁ, অনেক রোদে-জলে পোড় খেয়েছি আজ, নইলে সুনন্দন মজুমদার এককালে সুদর্শন মজুমদার ছিলেন।

—এখনই বা মন্দ কি? বাচ্চা মেয়েটাকে নাচাচ্ছেন তো কম নয়! অনীশবাবুর সহাস্য মন্তব্য।

থামিয়ে দিলুম ওঁকে—আঃ অনীশবাবু, প্লিজ! ডোণ্ট বি ভালগার! ...একে নাচানো বলেনা।... এ যে কি আপনাকে বোঝাই কি করে! আর বোঝাতে চাইলেও আপনি কি পারবেন তা বুঝতে? এ মধুর

বেদনায় অহরহ এমনি করে না জ্বললে আমিই কি আগে একে স্বীকার করে নিতে পারতুম!

উনিশশো একান্নয় মা মারা গেলেন। পরের বছর থেকে রেঙ্গুনে। সমীর বাবু গিয়েছিলেন ওঁদের কাজে। ওখানে আমার প্রতিপত্তি দেখে টেনে এনে বসিয়ে দিলেন ওঁদের ফার্মে।...তখন কি জানি যে, কোন্ দুর্লভ ভাগ্য অপেক্ষা করে আছে এখানে, আমারই জন্যে?

একটা সত্য স্বীকার করি। মিলার জন্যে সেই যে সব-ছাপানো আকুতি, বরাবরই সমপরিমানে ছিল তা সয়ে গিয়েছিল ধীরে ধীরে। ছবিটি হৃদয়পটে আঁকা ছিল ঠিকই তবে কালের কালি-ঝুলি লেগে বিবর্ণ হয়ে পড়েছিল বেশ কিছুটা।...মাঝে মাঝে মনে হতো মধুর রসের উৎসটি চিরকালের জন্যেই শুকিয়ে গেল বুঝি এ জীবনে। তারপরে মার চিঠির সেই কথাগুলি স্মরণে আসতো আবার, সান্ত্বনার প্রলেপ দিতো বুলিয়ে।

অবশেষে স্মরণ করুন সেদিনের সেই উৎসব-মত্তা চৌরঙ্গীর সন্ধ্যাবেলার কথা। মিথ্যে জবাবদিহি করে চলে গেলুম আপনাদের সঙ্গ ছেড়ে। কি করবো, তখন কি আর বিচার বিবেচনার অবসর ছিল আমার! সমীরবাবু এগিয়ে গিয়েছেন ট্যাক্সির সন্ধানে, আপনি আমি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। হঠাৎ চোখ পড়লো বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে। তারপরে সে দৃষ্টি আর ফিরলো না আমার:...দেখি আর একটি মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে টু-বি বাসের অপেক্ষা করছে সেই হারানো মেয়ে, একদা যার নাম ছিল শর্মিলা, যাকে আমি ডাকতুম মিলা বলে। দেড় যুগ আগে শেষবারের মতো দেখেছি যাকে, হাওড়া স্টেশনের সামনে বারান্দার নিচে। পিতৃশ্রাদ্ধের দিনে কানে পৌঁছেছে যার

শুভ বিবাহের সংবাদ। তারও চার পাঁচ মাস পরে যার মৃত্যুখবরের চিঠি পেয়ে বাওরা হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি পথে প্রান্তরে।···দেখলুম, হ্যাঁ, প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হলো, সেই বিদেহী কোন মায়াবী মন্ত্রগুণে অনুপম তনু দেহ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে চৌরঙ্গীর ফুটপাথে ধূলোর পথে পা ফেলে। অবাক হয়ে দেখলুম আঠারো বছর আগের সেই সপ্তদশী তিল পরিমানটুকু পর্যন্ত বদলায়নি!

হোটেলের বেয়ারা ঢুকে খবর দিলে ফোন এসেছে।

বললুম, যাচ্ছি।

অনীশবাবুর দিকে ফিরে বললুম, বলুন তো এ ভাগ্য আমার রাখি কোথায়? এ সুখ নিয়ে করি কি? একই জন্মে প্রিয়তমার জন্ম-জন্মান্তর প্রত্যক্ষ করলুম আমি। জানিনা, পুনর্জন্মবাদে আপনার আস্থা আছে কিনা, আমি কিন্তু স্থির সত্য মানি গতবারের শর্মিলাই এ জন্মে বাঁশরী রায়।

অনীশবাবুর চোখ দুটো দেখলুম প্রচ্ছন্ন কৌতুক হাসিতে কুঁচকে এলো। আসুক গিয়ে, আমি আর গ্রাহ্য করিনা ওসব!

বললুম, বসুন দু মিনিট, ফোনটা সেরে আসি।

নয়

অনীশের কথা

মুখে যতই বিনয় করুন, গল্প বলার কারি-কুরি নেহাৎ মন্দ না সুনন্দন মজুমদারের। কাহিনীটিও মোটামুটি হৃদয়গ্রাহী, যদিও কিছুটা মামুলি সন্দেহ নেই। আর কৈশোর প্রেমে এমনি একটা কাঁচা-মিঠে স্বাদ সচরাচর থাকেই। কিন্তু শেষটা একি করলেন উনি? ভূমিকা থেকে শুরু করে অধ্যায়ের পর অধ্যায় সহজ আয়াসে এগিয়ে এসে কিনারায় পৌছে তরী ডুবোনো, এ যে ক্ষমাহীন অপরাধ। এমন এক উদ্ভট কল্পনা ওঁর মস্তিষ্কে এলোই বা কি করে? যেন মিষ্টি একটি রাগিনী শেষ সমে পৌছবার ঠিক আগের মুহূর্তে সুরভ্রষ্ট হলো অকস্মাৎ; ---দেবরাজের সঙ্গীত সভায় এর চেয়ে লঘু অপরাধে গুরুতর দণ্ড বিধান হয়ে গিয়েছে বার বার!

অল্প দিনের মেলামেশা যদিও, লক্ষ্য করেছি ভদ্রলোক একটু অধিক পরিমাণে ভাব বিলাসী। তার উপরে প্রেমে পড়লে ও বালাই নাকি এমনিতেই বাড়ে। তবু তারও একটা সীমা থাকা চাই তো! নাকি শর্মিলার প্রেম আজ ঢেলে দিচ্ছেন বাঁশরীর অঞ্জলি ভরে। এ ধরনের একটি আপোষ তাই করে নিতেই হয়েছে ওঁকে নিজের অন্তরের সঙ্গে!

—কি ভাবছেন? কেমন করে একটা গুরুতর রকমের তর্ক ফাঁদা যায়? ফিরে এসে নিজের পরিত্যক্ত আসন পুনরধিকার করে মজুমদার প্রশ্ন করলেন।

বললুম, তা কেন, এ তো একেবারে সহজ কথাই পড়ে রয়েছে। ভালবাসার আদি পর্বে ঐ কথাটাই সব চেয়ে আগে মনে হয় কি না,— এ প্রেম বুঝি এ জন্মের নয়, এ প্রিয়া বুঝি অন্য জন্মের! আমিই কি কখনো কোন বিহ্বল মুহূর্তে জয়ন্তীর কানে কানে গুন গুন করে পড়িনি ভাবেন?—

"ডাকতে এলেম আমার হারিয়ে যাওয়া পুরোনোকে
তার খুঁজে পাওয়া নতুন নামে।
হে তরুণী
আমাকে মেনে নিও তোমার সখা বলে,—
তোমার অন্য যুগের সখা।"

যেন ওঁর মনের সব কটি লুকোনো কথাকে বাইরের রোদে হাওয়ায় মেলে ধরা হয়েছে, এমনি হঠাৎ খুশিতে উথলে পড়লেন মজুমদার। উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, বাজি ধরে বলতে পারি এ লেখা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো নয়, হতে পারে না। যতই কেন মূর্খ হই, এ নিশ্চয় ভুল হয়নি আমার।...তার পরে গম্ভীর গলায় যোগ করলেন, অনীশবাবু জয়ন্তী দেবীকে আপনি আদর করে কতকগুলো মিষ্টি মিষ্টি মিথ্যে বলেন, আমার জীবনে কিন্তু ও লাইন কটি আক্ষরিক অর্থে সত্যি!

—তাই কি?

—হ্যাঁ তাই। বিদ্যাপতির পদে আছে *"কিয়ে মানুষ পশু পাখি কিয়ে জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গে করম বিপাকে গতাগতি পুন পুন মতি বহু তুয়া পরসঙ্গে।"*—এত সহজে জন্মান্তরবাদের থিয়োরি বোধ হয় বাংলায় আর কেউ গুছিয়ে বলেন নি।...জানিনা, আপনি স্বীকার করেন কি করেন না, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি মৃত্যুতেই সব কিছুর

পরিসমাপ্তি নয়, হতে পারেনা, হওয়া সম্ভবও নয়। তারপরেও আত্মার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকেই এবং সেই আত্মা তার সমস্ত পূর্বজন্ম কর্মের ফলভাগ সেই সঙ্গে যত কিছু অপূর্ণ বাসনা কামনা নিয়ে আবার ফিরে আসে এই মর্তলোকে নতুন জন্ম নিয়ে, নতুন মায়ের কোলে।

বাধা দিয়ে বললুম, হয়তো আসে হয়তো আসে না, কে জানে! ও নিয়ে চিন্তা করিনি কখনো, প্রয়োজনও দেখিনা তার।

—চিন্তা করেন না তা নয় বুঝলুম, কিন্তু করার প্রয়োজনও বোধ করেন না, ওটা আপনার এড়িয়ে যাওয়া কথা হলো।…যা হোক আপনি একজন ধর্ম বিশ্বাসী ব্যক্তি, এটুকু অন্তত ধরে নিতে পারি বোধ হয় ?

—তার সঙ্গে এ প্রশ্নের তো সম্বন্ধ নেই।

—রয়েছে বৈকি! আমাদের হিন্দুধর্মে সর্বত্রই পুনর্জন্ম স্বীকার করা হয়েছে। স্বয়ং গীতা বলছেন,—

আবার বাধা দিতে হলো। বললুম, গীতা আমি পড়িনি, কিন্তু যে শ্লোকটি আপনি উদ্ধার করতে যাচ্ছিলেন এই মাত্র, বহুবার শুনেছি তা। ওটা প্রায় প্রবাদ বাক্যের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেচে।…কিন্তু গীতাই তো একা নন। নানা মুনির নানা মত যে এ বিষয়ে।…ইসলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারণা পোষণ করেন।…খ্রীষ্ট ধর্মগ্রন্থে তো স্পষ্টাক্ষরে রয়েছে—দাউ শ্যাল শিওর্‌লি ডাই—মৃত্যুতেই পূর্ণচ্ছেদ, তারপরে কিছুই আর নেই, থাকা সম্ভবও নয়।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে মজুমদার বললেন, আপনার কথা শুনে বিস্মিত হচ্ছি অনীশবাবু। গীতা পড়েন নি, কথাটা বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই উচ্চারণ করলেন, অথচ কিছু মনে করবেন না, খৃষ্ট ধর্মগ্রন্থ দেখেছি যথেষ্ট মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছেন আপনি।

হেসে উঠলুম কথা শুনে। বললুম, আশ্বস্ত হোন, গীতার ওপরে মোটেই তির্য্যক দৃষ্টি দিইনি আমি। আর বাইবেলের কথা যদি বলেন, এই সেদিনও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজি সিলেবাসে ইংরেজীর পেপারে বাইবেল ছিল কম্পালসারি।...আসল কথা তা নয়, আমার বক্তব্য ছিল সব কটি মতই তো আর এক সঙ্গে সত্যি হতে পারে না! কোনটা তবে মেনে নেবো, কোনটাই বা ছাড় দেবো?...অথচ মূল বক্তব্যে দেখুন, কোন ধর্মই পরস্পর বিরোধী নয়, বরং প্রত্যেকটিরই উদ্দেশ্য এক এবং অভিন্ন ; তা হলো, মানুষকে সৎ জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করা, এক কথায় ভাল হতে বলা। কিন্তু মুস্কিল রয়েছে মাঝখানে। প্রলোভন ছড়ানো চতুর্দিকে, তা এড়িয়ে লোকে চলবে কি করে? আর কেনই বা চলবে লাভ যদি হাতে হাতে মেলে? তাই তার চোখের সামনে খুব বড় আকারের একখানা চিত্র তুলে ধরা হলো শয়নে-স্বপনে-জাগরণে সব সময় যা কিনা তার নজরে পড়ে, তাকে ভাবতে শেখায় বর্তমানের লাভ লোকসানগুলো কিছু না, চিত্রগুপ্তের সেই আসল খাতাখানাই সব। সে ছবি কোথাও বেহেস্তের সুখৈশ্বর্যের, কোথাও শেষ বিচারের কাঠগড়ার, কোথাও বা পরজন্মের দুঃখ-সুখের। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন ধর্মের ফারাক এইখান থেকেই শুরু।

—আপনার বক্তব্য মেনে নিলেও কথা থেকে যায় কিন্তু। এতগুলো মতের কোন একটা যদি মানুষকে বেছে নিতেই হয় তবে যেটা তার স্বধর্মানুসারী সেইটেই কি বাঞ্ছনীয় নয়? কথায় বলে স্বধর্মে নিধনও শ্রেয়!

—ঠিক বলেছেন। তর্ক বাড়িয়ে লাভ নেই অযথা, যদিও স্বধর্ম কথাটার অর্থ নির্দেশে ভুল হলো আপনার। ধর্ম মানে এখানে হিন্দুর ধর্ম বা মুসলমানের ধর্ম তা তো নয়, স্বধর্ম বলতে এখানে প্রত্যেক মানুষের

একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত যে প্রকৃতি থাকে তাকেই অগ্রাহ্য না করে চলার উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আরও ব্যাপক অর্থ করতে গেলে কথাটা মানুষের স্বধর্ম অর্থাৎ মানবতা এ ভাবেও বোধ হয় প্রয়োগ করে চলে। কিন্তু অত কথায় কাজ কি, না হয় আপনার ব্যবহৃত মানেটাই স্বীকার করে নিচ্ছি।…আমি হিন্দু, আমার ধর্ম জন্মান্তরবাদ স্বীকার করে; হিন্দু ধর্মের সমস্ত খুঁটিনাটি নিঃসংশয়ে মেনে নিয়ে চলতে পারি ততখানি সহজ বিশ্বাস আমার নেই, পুনর্জন্মের থিয়োরিটাও সংশয়ের সঙ্গেই মেনে নিলুম। কিন্তু সুনন্দনবাবু, প্রশ্ন একটা তবুও যে বাকি থেকে যায়?

—বলুন?

—এই ধরণের কতকগুলো বিশ্বাস স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যেও একটা প্রচ্ছন্ন সর্ত থাকে যে। যেমন এই জন্মান্তরবাদের প্রসঙ্গের সঙ্গে একটা লুকোনো আশ্বাস সব সময়েই ওতঃপ্রোত জড়িয়ে আছে তা হলো, এ থিয়োরি শুধু মেনে নিয়েই খালাস আমি, আর কোন অতিরিক্ত দায় আমার নেই। অর্থাৎ যাদের মধ্যে অন্য জন্মে ছিলুম আমি, যাদের সংস্পর্শে, সম্বন্ধে, মিত্রতায়, শত্রুতায় গত জীবনের পাত্র পূর্ণ বা রিক্ত হয়েছিল আমার, যথা সময়েই চুকে-বুকে গিয়েছে তা, এজন্মে তার জের টানতে আসবেনা কেউ আর। দেহান্তর গ্রহণের পরে আমি যেমন তাদের চিনতে পারবোনা তারাও কেউ আমার খোঁজে ত্রিভুবন টহল দিয়ে বেড়াবেনা। প্রচ্ছন্ন এই সর্তটি ভঙ্গ হলেই কিন্তু মুস্কিল, বিশ্বাসে আর আশ্বাসে লড়াই বেধে যাবে। সে এক বিপজ্জনক স্নায়ু-যুদ্ধের অবস্থা।

—কদাচ কখনো মিরাকেল কি ঘটবেনা তা বলে?

—এ যুগে? তা কি সম্ভব আর?

স্থির চোখে আমার দিকে চেয়ে শান্ত গলায় মজুমদার বললেন, কিন্তু আমার জীবনে ঘটেছে যে!

—সেই কথাই তো ভাবছি। শর্মিলা যদি জন্ম নিলই আবার, রূপটি বদলে এলে বাধা কি ছিল তার?

—নইলে আমি তাকে চিনে নেবো কি করে?

সহাস্যে বললুম, জবাবটি আপনার তুল্য প্রেমিকের যোগ্য হলো সন্দেহ নেই। দুঃখ এই, লজিকের নিয়মগুলোর ওপরে রোলার চাপলো।…তাছাড়া সত্যিই যদি সেই মেয়েটির সঙ্গে বাঁশরীর শারীরিক কতকগুলো রেখার মিল সম্ভবই হয়ে থাকে, আঠারো বছর আগে সর্গতা হয়েছিল যে, সেটা আকস্মিক একটা—

বাধা দিয়ে মজুমদার বললেন, আপনার তিনটি কথারই উত্তর দিই একে একে। প্রথম কথা, লজিক্যাল ফ্যালাসির প্রশ্ন এখানে উঠতেই পারেনা, যেহেতু মিরাকেল কোন কালেই আপনার সিলজিসমের সিঁড়ি ভাঙার নিয়ম মেনে চলেনা!…মিলার সঙ্গে বাঁশরীর অবয়বের মিলের কথা তুললেন আপনি। কেমন করে বোঝাই আপনাকে, সে সাদৃশ্য শুধু কতগুলো দৈহিক রেখার নয়, একেবারে সর্বাঙ্গীন। আর আকস্মিক বলতে এর কোনটাকে বোঝাতে চাইছেন আপনি। বাঁশরী মিলার অনুরূপা এইটেই, না তার সঙ্গে আমার দেখা হওয়াটাও।

বললুম, দুটোকে এক করে জুড়তে চাই আমি।

মৃদু হাসলেন মজুমদার।—কিন্তু এ দুটোই সব নয় তো, আরও কিছু আছে যে। এর আগেও রয়েছে, পরেও ঘটেছে। আশা করি সব কটাকেই এ্যাকসিডেণ্টাল বলে উড়িয়ে দেবেন না আপনি। এ কথা তো ঠিক যে এ্যাকসিডেণ্ট কখনো পর্যায়ক্রমে পর পর ঘটে চলে না, ঘটতে পারে না।

দেখলুম উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন মজুমদার। বললুম, রাগ করছেন কেন? আমি তো শুনতেই চাই সব কথা। আপনার ওপরে যথেষ্ট আস্থা রয়েছে আমার, আপনার কথাও তাই গ্রহণ করতেই চাই। কিন্তু ঐ যে একটু আগে বিপরীত দুটো বিশ্বাসের কথা বললুম আপনাকে তাদের লড়াইটা যে থামানো দরকার আগে।

স্তিমিত গলায় উনি উত্তর করলেন, না, রাগ আমি করিনি তবে আপনার কণ্ঠস্বরে যেন একটা অনুকম্পার সুর বাজছে কিছুক্ষণ থেকে, সেইটে বড় বিঁধছে।

প্রসঙ্গ বদলের প্রয়াস পেলুম। বললুম, বাঁশরী জানে এ কথা?

—কেমন করে জানবে? ও তো জাতিস্মর নয়!

—আপনি বলেন নি ওকে?

—বলে তো ফল ছিল না কিছু। বরং নীরব যে হাসিটি নিছক সৌজন্যের বাঁধ মেনে এখনো বদ্ধ রয়েছে আপনার কণ্ঠে, উচ্চকিত রবে ফেটে পড়তো তা, বলতেন, মনগড়া এই গল্প ফেঁদে দুর্বল করেছি আমি বাঁশরীকে। সে সুযোগ আপনাকে দেবোনা, আপনাদের কাউকে না।

...এ ছাড়াও কারণ আছে একটা। আমি যে ওকে ভাল বেসেছি এ তো নতুন কিছু নয়, পুরোনো প্রেমেরই পুনর্ণবা রূপ। কিন্তু ও তো আমায় চেনেনা! ওতো জানে না আমায়! না জেনে না শুনেই তুলে দিতে ব্যাকুল নিজেকে আমার হাতে। মিশ্র একটা আনন্দ আস্বাদে পরিপূর্ণ মনে হচ্ছে তাই নিজেকে। একই সঙ্গে আমার পৌরুষ পাচ্ছে নতুন জয়ের সুখ, আমার সত্য পাচ্ছে নতুন প্রমাণের দৃঢ়তর ভিত্তি।...বাইরে অন্ধকার হয়ে এলো, আলোটা জ্বেলে দিই?

—থাক আর একটু, এখনো তো আসছে অল্প আলো। অপনার

এই আশা-সংশয়ের আলো-আঁধারের গল্প শুনতে প্রদোষের এই স্বচ্ছ অন্ধকারটি লাগছে বেশ।

—আশা-সংশয় বললেন? কিন্তু আমার মনে তো কোন সংশয় নেই আর! সত্যের যে দুর্লভতম রূপ প্রত্যক্ষ করেছি নয়ন-মন ভরে তা আমার কাছে বিষণ্ণ বর্ষার শেষে আশ্বিনের প্রসন্ন সকালের মতো শুভ্রতায় উজ্জ্বল, আনন্দে নির্মল। ···বাকিটুকু শুনুন তবে!

—বলুন।

মজুমদার খেই ধরলেন।—সেই যে সেদিন পথের মধ্যিখানে বাঁশরীর দেখা পেয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটেছিলুম, তার আগে আরও একটি ঘটনা ছিল। ঠিক তার চার দিন আগের।···

···ধর্মতলা স্ট্রীটে বসে আছি একখানি প্রায়-অচল ট্রামে। এস্‌প্লানেডের মোড়ে ট্রাফিক আটকেছে পুলিশ। সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়েছে একটার পর একটা ট্রাম। দুপা করে এগুচ্ছে, থেমে থেমে জিরোচ্ছে। রাত আন্দাজ সওয়া নটা হবে।

পাশের কোন্ দোকান থেকে রেডিওতে ভেসে আসা একটি গানের কলি—একেবারে মেরুদণ্ড সিধে করে বসিয়ে দিলে আমায়। গানটি ছিল রবীন্দ্রনাথের,—

আজ তারায় তারায় দীপ্ত শিখার অগ্নি জ্বলে
নিদ্রাবিহীন গগন তলে।

বহুকাল আগে একদা শুনেছিলুম এই গান, শুনে মুখস্ত করেছিলুম। বটানিকসে মিলার গলায়। সেই একটি বারই শুধু গান শুনিয়েছিল ও।···ট্রাম চললো হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে। একটু গিয়েই একটা রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়ালো আবার। তখন অন্তরা গাওয়া হচ্ছে,—

ঐ আলোক-মাতাল স্বর্গসভার মহাঙ্গন,
হোথায় ছিল কোন্ যুগে মোর নিমন্ত্রণ
আমার লাগলো না মন লাগলো না,
তাই কালের সাগর পাড়ি দিয়ে এলেম চ'লে
নিদ্রাবিহীন গগন তলে ॥

একটু করে এগিয়ে একটু করে থেমে ধীর গতিতে চলতে লাগলো আমার ট্রাম। আর কখনো উত্তরের কখনো দক্ষিণের এ দোকান ও দোকান থেকে মর্মে এসে পৌছুতে লাগলো একটি দুটি করে কলি। নিউসিনেমার সামনে এসে শেষ হলো গান। গায়িকার নামের ঘোষণা শুনলুম বাঁশরী রায়।

বহুদিন আগে শুনেছিলুম মিলার গান। কাজেই দুটি গলার যে হুবহু মিল ছিল হলফ করে বলতে পারবোনা। তবে বুকের মধ্যে যেন ঘা পড়েছিল আমার। চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল বহু বছর আগের একটি হারানো ছবি,—সেই সবুজ বন···অলস দুপুর···গঙ্গার কিনারে ক্লাশ পালানো সেই দুই কিশোর-কিশোরী। অত স্পষ্ট করে মিলার মুখ স্মরণে এলো অনেক দিন বাদে। তখনো কি জানি মাঝখানে মোটে চারটি দিন, তারপরে সেই পুরোনো ছবির পট ছিঁড়ে প্রকাশ হবে জীবন্ত শর্মিলা নতুন করে আবার! সেদিন কি জানি কে এই মেয়ে বাঁশরী রায়!

—তারপর?

—সেদিন সেই ছুটলুম তো আপনাদের ছেড়ে, সে বাসখানা কিন্তু ধরতে পারিনি।

—আমিও লক্ষ্য করেছিলুম তা।

—যাহোক পরের খানা ছিল পিছনেই, উঠে পড়লুম দুর্গা বলে। বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল নিশ্চয়, নইলে একটা ট্যাক্সি করার কথা মনে পড়তো! ···হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে চললুম, কোথায় নামে ওরা যদি হদিশ মেলে। তাই কি হয়। দুটি গাড়ির মাঝখানের ফাঁক দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকলো ক্রমে। শেষে দেখাই গেলনা ওদের গাড়ি আর একটু পরে। তবু আন্দাজ করে নামলুম এক জায়গায়। পাত্তাই নেই ওদের।

পরের দুটো দিন সময় পেলেই হানা দিলুম সেই নির্ধারিত স্থানে, যদি দর্শন মেলে। কিন্তু বৃথা।···ইতিমধ্যে রেঙ্গুন যাবার কথা। পা কি তখন নড়তে চায় কলকাতা ছেড়ে? ঠেলে ঠুলে পাঠালো সমীর। নভেম্বরের গোড়া থেকে ও নিজে ছিল বার্মায়। সুবিধে না হতে আমিই লিখেছিলুম ফিরে আসতে। কাজেই এখন না বলি কি করে, যেতে হলো। অথচ পুরোনো ক্ষতের মুখ খুলে গিয়েছে সত্ত সবে, জ্বালা কি কমে? সারা দিন কাটতো অসম্ভব ব্যস্ততায়, পার্টির সঙ্গে বোঝাপড়া, কাস্টম্‌সে আনাগোনা, শিপমেন্টের নানান ঝক্কি। সব সেরে হোটেলে ফিরতুম অনেক রাত্রে। দুগাল মুখে পুরে শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচি এমন অবস্থা তখন, অথচ বিছানায় গিয়ে যেই না শুয়েছি ঘুম যেতো উবে। চিন্তার সঙ্গী সেই মুখ, সেই গান।···হোটেলের জানলায় দাঁড়িয়ে নিচে সামনে কালো নদীর অতল জলের দিকে চেয়ে ভাগ্য বিশ্লেষণ করতুম।···চকিত একটি মূহূর্তের জন্যে যাকে দেখে এলুম কলকাতার পথে সে কি শুধুই কল্পনা আমার, না কি ধরা যায় তাকে, ছোঁওয়া যায় হাতের স্পর্শে!

ফেব্রুয়ারির গোড়ায় ফিরলুম। প্রথম দিনেই দেখা! সমীর পরিচয় করিয়ে দিলে ওর নতুন টাইপিস্টের সঙ্গে। নাম শুনলুম বাঁশরী রায়।

চোখে আমার পলক পড়লোনা আর! এরই গান শুনেছি আকাশ-বানীর আসরে, একেই দেখা পেয়ে হারিয়েছি বাস স্টপেজে, এরই সন্ধানে ঘুরে মরেছি রেঙুন যাবার আগের দুদিন পথে পথে! এখন দেখি আমারই অফিস ঘর আলো করে বসে আছে সেই মেয়ে, শব্দ বুনছে রেমিংটনের টাইপ রাইটার মেসিনে।

···সংযম দেখিয়েছি যথেষ্ট। এড়িয়ে চলেছি ওকে গোড়া থেকেই। ভেবেছি, এতই যদি দিলেন ঈশ্বর সামান্য আর একটু ধৈর্য কেন না ধরি? নিজে যদি নাই ডাক দিই, ওকি ডেকে নেবেনা আমায়?···অসহ্য লেগেছে এক এক সময়ে, একটুখানি প্রশ্রয় পাবার লোভে সমীর ওর পিছু পিছু ঘুরেছে, দেখে ঈর্ষায় জ্বলেছি। বাইরে কিন্তু বজায় রেখে গিয়েছি পরম নির্লিপ্ত ভাবটি। একদিন কেবল রুখতে পারিনি নিজেকে। একটা থিয়েটার দলে মিশে মাতামাতি করছিল, তাই নিয়ে অল্প দুচারটে মন্তব্য করে ফেলেছিলুম। ছেড়ে দেবার মেয়ে নয়, উল্টে আমাকেই দুচারটে মিঠে-কড়া কথায় সমঝে দিলে,—আমার কি অধিকার কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা গলানো, ইত্যাদি ইত্যাদি। যতকিছু রুদ্ধ আবেগ ফেটে বেরুতো সেই দিনই। জানিয়ে দিতুম ওকে অধিকারটা কোথায় আমার। কিন্তু আত্মস্থ থেকেছি, শামুকের মতো নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছি নিজেকে।

শেষে একদিন ভোর রাত্রে ডাক এসে পৌছুল! গিয়ে দেখি বিষাদের মূর্তিটি হয়ে বসে রয়েছে। আহ্বান যে এমন দুর্দিনে আসবে তা কোনদিনই ভাবিনি।···

তারপরে একটু একটু করে কবে যেন ঘনিষ্ঠতর হয়ে পড়েছি দুজনে। দিন তারিখ গুছিয়ে বলা সম্ভব নয় তার। আকাশ-প্রদীপের নাট্যরূপ

ও নিজের সক্রিয় ইচ্ছাতেই ছাড়লে। সমীরবাবুর সঙ্গে আমার যে বিসম্বাদ চলেছে তার কারণও বুঝতে পারছেন আশাকরি!

বললুম, হ্যাঁ, জয়ন্তী এ ধরণের ইঙ্গিত একটি দিয়েছিল আমায়। প্রত্যাখানের অপমানটা ভুলতে পারছেনা সমীর।

উঠে ঘরের আলো জ্বেলে দিলেন মজুমদার। বললেন, এবার আমার কথার জবাব দিন। বলুন, এর কোনটিকে আকস্মিক বলে উড়িয়ে দিতে চান আপনি। ওর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ, সেই সঙ্গে মিলার সঙ্গে ওর আশ্চর্য সাদৃশ্য দুটোই আপনি এ্যাকসিডেণ্টাল বলে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু আগের ঘটনাটি? কেন সেই গান শুনলুম ওরই গলায়, মিলার কণ্ঠে শোনা সেই বিস্মৃত গান? তারপর দেখা পেয়ে আবার হারিয়ে ফেলা, এখানেই তো শেষ হতে পারতো! আবার কেন খুঁজে পেলুম ওকে আমারই অফিস ঘরের কোণে? আর ফিরে দেখা সত্বেও আমি তো এড়িয়ে চলতেই চেয়েছিলুম। ও কেন নিজে থেকে ডাকলে আমায়? সেখানেও শেষ হতে পারতো সব কিছু। কেন ও এমন করে টানলে আমায়? কেন ওর নিজের ভাগ্য ইচ্ছে করে জড়ালে আমার ভাগ্য-সূত্রে?···গত পরশু কথা হচ্ছিল ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে নোটিশ দেওয়ার বিষয়ে। বললুম, ভাল করে ভেবে দেখো বাঁশরী, এখনো সময় রয়েছে। আমার বয়স সায়ত্রিশ পৌছুল, আর তুমি মোটে আঠারো ছুঁলে। ·আমার তুলনায় তুমি নেহাতই ছেলেমানুষ এখনো। জোর করে আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে ও বললো, বাজে কথা রাখো, ওতে কিছু যায় আসে না। আমার মা'ও বাবার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন।

আমি চুপ করে বসে এই আশ্চর্য গল্পটির কথা ভাবতে লাগলুম।

মজুমদার তাড়া দিলেন, কি ভাবছেন অত?

—আপনার আর বাঁশরীর কথাই।

—বিশ্বাস করলেন?

বললুম, এই মুহূর্তে আপনার ঘরের এই পরিবেশে, সর্বোপরি আখ্যানের নায়ক স্বয়ং আপনার মুখ থেকে শোনার পরে, বিশ্বাস করি না ঠিক এতটা বলার মতো জোর পাচ্ছি না গলায়।

—তার মানে এখনো সংশয় রয়েছে আপনার মনে! দোষ দিইনা আপনাকে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না হলে এ ধরণের কোন ঘটনা শুধু পরের মুখ থেকে শুনে, তা সে ব্যক্তি যত বিশ্বাসভাজনই হোক না কেন, বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া সহজ নয় অত!···তাছাড়া যে যুগে এবং যে দেশে বাস করছি আমরা তাতে সংশয়বাদি হওয়াটাই আমাদের অনিবার্য ভূমিকা। সব কিছুই মেনে চলি আমরা, একই সঙ্গে রোগের প্রতিষেধক টিকেও নিই, আবার দেবতার দুয়ারে মানত করতেও বিন্দুমাত্র পিছুপা হই না। অর্থাৎ শাদা বাংলায় বলতে গেলে কোনো কিছুতেই পুরো আস্থা নেই আমাদের সন্দিগ্ধ অসম্পূর্ণ মনের। এ বিষয়ে আমরা সেই পুরাকালের জমদগ্নি মুনির মতো, একই সঙ্গে নাস্তিক, আবার পরম আস্তিক!

উঠে গিয়ে টেবিলের ধারে দাঁড়ালেন মজুমদার। ড্রয়ার টেনে চাবি বের করে ঘরের কোণে স্যুটকেশটি খুললেন। লম্বা চওড়া আকারের হাফ-বাইণ্ডিং একখানা বই এনে খুলে ধরলেন আমার সামনে।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালুম।

বললেন, দেখুন পাতা উল্টে।

ওঁর উদ্দেশ্য বোধগম্য হলো না ঠিক। বইখানা হাতে তুলে নিলুম।

দেখি খানকয় বিদেশী পত্রিকা একসঙ্গে বাঁধানো হয়েছে। সব কটিই ফটোগ্রাফি সংক্রান্ত ম্যাগাজিন। বিভিন্ন নামের এবং সতন্ত্র মাপের কাগজগুলি, তাই বাইরে থেকে যতখানি সুদৃশ্য লাগে, হাতে নিয়ে খুলতে গেলে অতটা দেখায়না। পাতা উল্টোতে লাগলুম। একখানা পৃষ্ঠা খুলে সহসা দৃষ্টি একেবারে থমকে গেল আমার। দেখি বাঁশরীর চেনা মুখের ছবি! বসে আছে ও ঘাটের শেষ পৈঠেয় নদীর জলে পা ডুবিয়ে, হাত দিয়ে জল নেড়ে খেলা করছে।

চোখে চোখ পড়তে মৃদু হাসলেন মজুমদার,—না বাঁশরী নয়, মিলার ছবি ওখানা। দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার ধারে তোলা। ছবিটি নিতে ফুল প্যাণ্ট ভিজিয়ে এক হাঁটু জলে নামতে হয়েছিল আমায়।··· আরও আছে, পাতা উল্টে যান।

ছখানি ম্যাগাজিনে মোট ছখানি ছবি রয়েছে শর্মিলার। কে বলবে এ মেয়ে বাঁশরী নয়! সে নিজেও যদি দেখে, অবাক হয়ে ভাববে নিশ্চয়, তার অজান্তে এ ছবি তোলা হলো কি করে।

বললুম, এ যে হুবহু মিল দেখছি!

চুরুটটি ধীরে সুস্থে ধরিয়ে নিয়ে মজুমদার জবাব দিলেন, উঁহু, একেবারে এক নয়, কিছু কিছু তফাৎও আছে। লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন।···অধুনা মেয়েদের অমন ভাবে পাতা কেটে চুল বাঁধার রেওয়াজ আর নেই। ব্লাউজের হাতাও আজকাল ক্রম নিম্নগতি। ছাপা শাড়ি অবশ্য নতুন করে ফিরছে আবার। তাছাড়া, পত্রিকাগুলি মনোযোগ দিয়ে দেখলে অবশ্যই চোখে পড়বে আপনার সব কটি সংখ্যাই প্রায় দেড় যুগ আগের।

বাধা দিয়ে বললুম, বাজে ঠাট্টা রাখুন, এ যে সত্যই সম্পূর্ণ অভিন্ন দুজনে। তিলটুকু ভেদ নেই।

বইখানি আমার হাত থেকে নিয়ে সযত্নে বন্ধ করলেন মজুমদার, বললেন, এরপরে আর কি বলবেন আপনি ?

—কিছুই বলবোনা। অবাক হয়ে ভাববো, এ অসম্ভব সম্ভব হয় কি করে !

একসঙ্গে বেরোলুম দুজনে হোটেল থেকে। উঠলুমও একই বাসে। উনি নামবেন বাঁশরীর ওখানে, আমি শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে।

পথে কথাবার্তা সম্ভব ছিল না, অসম্ভব ভিড়। তারই মধ্যে একবার পাশের লোকের মাথা টপকে আমার কানের কাছে মুখ আনলেন মজুমদার। ফিসফিস স্বর শুনলুম, কি অত ভাবছেন তখন থেকে, নতুন তো নয় কিছু ! চন্দ্রমৌলি শঙ্কর কি তাঁর হারানো সতীকে নতুন জন্মে পার্বতীর রূপে ফিরে পাননি ?

পাগলটাকে নিয়ে কি যে করি, ঘাড় নেড়ে হেসে সায় দিতে হলো।

হেদুয়ার কাছাকাছি এসে যেমনটি ভাবা ছিল আগেই, জিদ করতে লাগলেন মজুমদার, অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্যে একবার নামতেই হবে বাঁশরীর ওখানে। মিলার কাহিনী শোনার পরে নতুন চোখে একবার দেখে যাবোনা ওকে, তাও কি হয় ?

বললুম, অসম্ভব। আজ আর কিছুতেই পারবোনা তা।

কিন্তু যে লোক যুক্তি তর্কের ধারে ঘেঁসেনা তার কাছে নিস্তার পাওয়া কি সোজা কথা ! নামিয়ে তবে ছাড়লেন। বললেন, বছরে তিনশো পঁয়ষট্টিটি দিনের সব কটিই কি সমান কাজে আসে অনীশ বাবু ? আজ আপনার সেই বিনা কাজের দিন।

বাঁশরীদের গলিতে ঢুকতে প্রথম মুখেই দেখি অন্ধকার। ঠিক মোড়ের আলোটি খারাপ হয়ে রয়েছে।

চুরুটে লম্বা একটি সুখটান দিয়ে ফেলে দিলেন মজুমদার। বললেন, সিগার খাওয়াটি ছাড়তে হবে এবার। আপনার বোন এর কড়া গন্ধ সইতে পারেনা মোটে।

আমি যথারীতি নীরব শ্রোতা।

অন্ধকারেই আমার মুখখানা যথাসাধ্য নিরীক্ষণ করে দেখলেন উনি। বললেন, অমন মিটি মিটি হাসছেন কেন বলুন তো তখন থেকে? মজা পেয়েছেন খুব, না?

—কি যে বলেন, এ হেন সিরিয়স কথায় হাসি আসতে পারে কখনো?

দুজনেই হেসে ফেললুম।

খান কয় বাড়ি পরেই লম্বা একটি রোয়াকে আড্ডা জমিয়ে বসেছে জন কয়েক নিষ্কর্মা। সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, এই রত্নগুলি চিনে রাখুন ভাল করে, কদিন ধরে খুব জ্বালাতন করছে এরা বাঁশরীকে।

—চিনে রেখে আর ফল কি বলুন? দু এক দিনের মধ্যেই তো ছেড়ে দিচ্ছে বাঁশরী এ পাড়া।

—সেই জন্যেই তো বলিনি কিছু। নইলে একটা বোঝাপড়া হয়েই যেতো এতদিনে।

বাঁশরীদের বাড়ির সামনে পৌঁছে দেখি দরজা বন্ধ। কড়া ধরে নাড়তে পাশের দরজা দিয়ে বাইরে এলো যথারীতি শ্রীমান রমেন্দ্র। বললে, বাঁশীদি তো নেই। গান শেখাতে গিয়েছে, ফিরতে এখনো ঘণ্টা দুই।

মজুমদারের স্বগতোক্তি শোনা গেল। ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো হয়েছিল, তাই নিয়েই বেরুলো?

বললাম, তা কি করবে, চাকরি আগে, তার ওপর আছে নাকি আর কিছু?

নেমে আসবো দুজনে, চোখ পড়লো দরজার ঠিক পাশের দেওয়ালে। খড়ি দিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে, বড় বড় হরফে লেখা,—

অদ্য রজনীর মধুর আয়োজন
এ ঘরে একটি বঁধুর প্রয়োজন।

দিন দুই আগেই জামাই-ষষ্ঠি গিয়েছে, বোঝা গেল সেই উপলক্ষ্যেই এ রসিকতা।

মজুমদারের চোখ দুটো জ্বলতে লাগলো। বললেন, একটু দাঁড়ান, লেখাটা মুছে দিয়ে যাই।

পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘসে ঘসে খড়ির দাগগুলো ওঠাতে লাগলেন উনি। পথ চলতি একটি দুটি লোক থমকে দাঁড়িয়ে কাণ্ড দেখতে লাগলো সকৌতুকে।......

ফিরতি পথে সেই রোয়াকের কাছ বরাবর এসে প্রশ্ন করলেন, এদেরই কাজ হবে, কি বলেন?

বললুম, অসম্ভব নয়।

আমাদের দেখে ইতিমধ্যে নড়ে চড়ে বসেছে দলটি, কি যেন ইঙ্গিত ইসারাও হয়ে গেছে ভেতরে ভেতরে।

আর একটু কাছে আসতে একজন গুণগুণ করে সুর ধরলে।

মজুমদার বললেন, শুনছেন অনীশ বাবু?

—শুনছি তো, সেই ইচক দানা।

—উঁহু, তা নয়। কথাগুলো শুনুন ভাল করে।

ঠিকই ধরেছেন উনি। সুরটি তাই বটে কথাগুলি অন্য। মাঝে-মধ্যে বাঁশী নামটি ঢোকানো, সুনন্দন কথার একটি অপভ্রংশও কানে এলো একবার।

—আপনাকেও ওরা চেনে দেখা যাচ্ছে।

—উঁহু, এখনো চেনেনা। তবে আজ ঠিক চিনবে, কার মুখ দেখে সকালে ঘুম ভেঙেছে বেচারার!

রাগে ফেটে পড়লেন মজুমদার। এগিয়ে গিয়ে গাইয়ের জামাটা ধরে হিড় হিড় করে টেনে নামালেন রাস্তায়।— কেন গাইছিলে এ গান ভাই?

—বেশ করেছি!

—বটে?...ঠাশ করে একটি চড় পড়লো বাঁদিকের গালে। তার পরে আবার প্রশ্ন, বলো, কেন গাইছিলে এ গান? কপালে আজ অনেক দুঃখ লেখা তোমার!

যাকে বলা হলো, চড়ের ওজন দেখে তার নিজেরও বুঝতে বাকি ছিল না সেকথা, তবু তড়পে উঠে জবাব দিলে, এটা আমাদের পাড়া, যা খুশি গাইবো, আপনি বলার কে মশাই?

ততক্ষণে আর একটি চড় পড়েছে বিপরীত দিকের গালে।— এবার বলে ফেলো দেখি কেন গাইছিলে এ গান?

উত্তর দেবে কি, সে ততক্ষণে পালাতে পারলে বাঁচে। মজুমদারও প্রশ্ন করা স্থগিত রেখে হাতের সুখে একবার এ গালে একবার ওগালে রীতিমতো বাঁদর চড়ানো করে চলেছেন।

এত দ্রুত ঘটে গেল সব কিছু, আমি প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। লোকজন যারা দাঁড়িয়ে গিয়েছে ভিড় করে তাদেরও কেউ জানতে চাইছেনা ঘটনাটা আসলে কি?

তারপর ছাড়া পেয়ে গায়ক প্রবরের পায়ে পায়ে পশ্চাদপসরণ।...

এতক্ষণে ওর সঙ্গী কজনের টনক নড়লো। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে একজন আরেক জনকে চিৎকার করে বললে, এই ঘনা, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? হাঁক দে একবার বড়-বাবড়িদাকে, কোথায় থাপ খুলতে এসেছে বুঝিয়ে দিক পাঁচুকে! মারের চোটে কাঁপ ছুটকে যাবে, শালাকে আর ও হাতে করে খেতে হবেনা কোনদিন!

অবহেলার দৃষ্টিতে তাদের দিকে একবার তাকিয়ে মজুমদার বললেন, চলুন এবার যাওয়া যাক। বাঁদরামি করতে এ জন্মে আর সাহস হবেনা এদের!

...রাস্তার মোড়ে পৌঁছে বললেন, বাঁশরীকে আর ঘাঁটাতে চাইবেনা ওরা, কি বলেন?

—কি জানি! ঐ যে কে বড়-বাবড়িদা না কি বললে তার সঙ্গে তো মোলাকাত হলোনা, কে জানে কেমন মহাজন তিনি!

—ও সব কিছু না। খানিকটা ভাঁওতা মেরে দিলে। আজকাল পুলিশ খুব কড়া নজর দিয়েছে এই সব রক্‌বাজদের ওপর। ও বাবড়িদা কেন, জুলপি দা, গালপাট্টাদা সব দাদারাই মিইয়ে আসছে ক্রমে। তাছাড়া, নিশ্চয় পাড়াতেও কেউই ভাল চোখে দেখে না দলটাকে। দেখলেন না, অতখানি ভিড় জমলো, কেউ একটা কথা বললে ওদের হয়ে?

একবার মনে হলো ঘনা বলে যাকে ডাকতে শুনলুম তাকে যেন দেখেছি কোথাও আগে। মনে করতে পারলুমনা ঠিক!

বাড়ি ফিরলুম।

এরই মধ্যে শোবার ঘরে সবুজ আলো জেলেছে কেন বোঝা গেলনা। সবে তো এই সাড়ে আটটা।

জয়ন্তী বেরিয়ে এলো ঘর থেকে, বললে এত দেরি যে ?

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধোলুম, এর মধ্যেই শুয়ে পড়েছিলে না কি ? শরীর ভাল তো ?

জবাব না দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

ভাবনা দ্বিগুণ হলো। সেই মাথা ধরাটা আবার নতুন করে শুরু হলো নাকি ?

—আমার ভাবনা ভেবে ভেবে তো ঘুম হচ্ছেনা তোমার। বড় আলোটা জেলে দিয়ে বললে, দেখ কি সুন্দর একখানা টেব্‌ল ক্লথ তৈরি করেছে বাঁশরী তোমার জন্যে।

দেখি কচি কলাপাতা রঙের একটি সুদৃশ্য ঢাকা আমার টেবিল আলো করে।—বাঃ, বেশ চমৎকার তো! কতক্ষণ আগে এসেছিল বাঁশরী ? সেই জন্যেই বাড়িতে পাওয়া গেলনা, অথচ বললে গান শেখাতে গিয়েছে।

—ও, তাই বুঝি এত দেরি তোমার ?···না, আজকে এর মধ্যে আসেনি বাঁশরী, সেই গত জেনারেল স্ট্রাইকের দিনেই দিয়ে গিয়েছিল ওটা। এত দিন বলিনি তোমায়, কচি কলাপাতা রঙ এত ভালবাসো তুমি জানতুম না তো, ভাবলুম ঘরে যা কিছু জিনিস সব এক রং করে একেবারে বলবো তোমায়।

হেঁয়ালিটি বোধগম্য হলোনা। চেয়ে দেখি বিছানার কভারটিও কচি-কলাপাতা রঙের। শুধু তাই বা কেন, দরজা জানালার পর্দা থেকে রেডিওর ঢাকা পর্যন্ত সব ঐ এক রঙের। খেয়াল হলো ঘরের আলোটাও তো ঐ রঙেরই দেখেছি একটু আগে, আগেরটা ছিল ঘোর নীল। আশ্চর্য হয়ে বললুম, সবার রঙে রঙ মিশিয়ে ফেলেছো একেবারে, ব্যাপারটা কি বল দেখি ? আলোটা পর্যন্ত বদলে দিয়েছ!

মুখ টিপে তীক্ষ্ণ হেসে জবাব দিলে, সেই জন্তেই তো দেরি হলো কদিন, ও রঙের বাল্‌ব কোথাও পেলুম না এদিকের দোকানে।

—তা না হয় বুঝলুম, কিন্তু হঠাৎ এ রঙের ওপর এতখানি পক্ষপাতিত্বের হেতু?

তোমার জন্তেই শুধু! এতদিন ঘর করছি একসঙ্গে, একটিবারও বলেছিলে কচি-কলাপাতা রঙ এত ভালবাসো তুমি? দোকানে যাও আমার সঙ্গে সে শুধু ঠুঁটো জগন্নাথটি সেজে বসে থাকার জন্তে। আমি এটা টেনে সেটা হাঁৎড়ে দোকানদারকে দু পাঁচটা মিষ্টি মিষ্টি ধমক দিয়ে জিনিস পছন্দ করে মরি! যত মনের কথা সব শুধু বাঁশরীর সঙ্গে! না?

চোখের চাউনিতে ওর মেঘের শ্যাম-ছায়া দেখে আমারও চিন্তার বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলো সহসা। মনে পড়ে গেল বাশরীদের বাড়ি সেই দিনটির কথা,—আমি বাঁশরী সমীর তিনজনে মিলে রং বাছাবাছি। কে জানতো সেদিনের তিল আজ এমনি ভাবে কানা তাল হয়ে আমারই পিঠে এসে পড়বে!

...ভাবলুম, দিই ওকে আরো খানিকটা রাগিয়ে, মজা হবে বেশ!... তারপরে ঘা লাগলো মনে। তুচ্ছ একটা টেবিলের ঢাকা নিয়ে এতখানি ভুল বুঝলে জয়ন্তী আমায়? যা ইচ্ছে ভাবুক ও, কোন কথার আর জবাব দেবোনা আমি।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু দুটোর কোনটাই পারা গেলনা। সুনন্দন-শর্মিলার সেই গল্পটা ওকে না বলা পর্যন্ত শান্তি নেই মনে। কাজেই মিটমাট করে নিতে হলো আমাকেই সাধ্য সাধনা করে। বাঁশরীদের বাড়ি সেদিনের ঘটনাটা খোলাখুলি বললুম। সমীর আর বাঁশরী, ওদের দুজনের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে কি করে একটা হঠাৎ

মনে-আসা রঙের কথা বেরিয়ে গিয়েছিল জিভ ফসকে, সবিনয়ে তা নিবেদন করতে হলো মানিনীর দরবারে।

ভাব-ভঙ্গী দেখে বোঝার উপায় নেই কানে ঢুকছে কিনা কথাগুলো, তবে মেঘটা খানিক কাটলো মনে হলো। যখন বললুম ঝগড়া রেখে কি দেবে দাও ক্ষিদে পেয়েছে ভারি, তাড়াতাড়ি ছুটলো রান্না ঘরের দিকে।

খেতে বসে ধীরে সুস্থে বললুম, কি যে একটা তুচ্ছ কথা নিয়ে উল্টো বুঝলি রাম হয়ে মন খারাপ করে বসে আছো। আজ এমন গল্প শোনাবো তোমায়, বাঁশরীর বিষয়ে এতদিনের সব ধারনাই বদলে যাবে একেবারে।

চোখে একটি মারাত্মক তীর হেনে বললে, ফের, আবার সেই বাঁশরীর কথা শুরু হলো?

জখম হতে হতে সামলে নিয়ে বললুম, ক্ষেপেছো, বাঁশরীর নাম উচ্চারণ করি আর! আজ তোমায় বলবো পাটনার মেয়ে শর্মিলার কথা। সুনন্দন মজুমদারের কাছে শুনে এলুম এইমাত্র।

—আবার একটি বোন এসে জুটলো বুঝি? আছো বেশ!

শোবার সময়ে শুলো এসে খাটের একেবারে ধার ঘেঁসে, যতখানি সম্ভব ফাঁক রেখে মাঝখানে। তদুপরি পাশ বালিশের লম্বা পার্টিশন পড়লো।

বুঝিয়ে দিলে সন্ধি করতে রাজি নয় এখনো।···

তারপরে শর্মিলার সেই কাহিনী একটু একটু করে যখন শেষ হলো, দেখি কখন সরে সরে এসে একেবারে বুকের কাছটিতে শুয়ে। ধরা গলায় বললে, সে ছবিগুলো নিজের চোখে দেখলে তুমি?

—তাই তো বলছি। একখানি একখানি করে দেখেছি।

আরো কিছুক্ষণ পরে।

—শুনছো !

—উঁ ?

—ঘুমোলে ?

—না, ঘুম আসছে না।

—রাগ করেছো আমার ওপর, না ?

—কই, না তো !

—হ্যাঁ করেছো, তোমায় চিনিনা আমি !···দেখো, আমরা মেয়েরা ভারি হিংসুটে ! বাঁশরী এসে সেদিন যখন বললে তোমারই পছন্দমতো করে এনেছে টেবিল-ক্লথটা, মাথার মধ্যে দপ করে যেন আগুন জ্বলে উঠলো। এই কদিন ধরে উঠতে বসতে জ্বলেছি পলে পলে, তুমি তার কি খবর রাখো ! এবারের মতো ক্ষমা করো লক্ষীটি, আর কখনো যদি অবিশ্বাস করেছি তোমায়।

কাছে টেনে বললুম, জয়তী জয়ন্তী জয়-জয়ন্তী তুমি একটি আস্ত বোকা। তোমার ওপরে রাগ করবো এ কথা ভাবতে পারলে তুমি ?··· এ দেখি সেই রবি ঠাকুরের গানের মতো, 'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায়না !' কি জানো, আসলে তোমরা মেয়েরা মাত্রেই ভীতু ভারি। হাতের মুঠোয় বন্ধ করেও সংশয় কাটেনা তোমাদের, এই বুঝি ফাঁক পেয়ে পালালো।···দেখতো, মাথা খারাপ করে এই মাস কাবারের মুখে কতগুলো টাকা শুধু শুধু নষ্ট করে এতসব জিনিস-পত্র কিনে বসলে।

—মাগো, কি কৃপণ হচ্ছো দিন কে দিন ! নষ্ট কেন শুনি ?

—না তো কি ! কাল সকালেই তো টান মেরে ফেলে দেবো সব, যেখানে যত কিছু কচি-কলাপাতা রঙের জিনিস আছে এ বাড়িতে।

— সব ফেলে দেবে ?

—সমস্ত !

—হ্যাঁ গো, পারবে ?

—দেখোই তখন !

—বাঁশরীর অমন উপহারটাও ?

দেখি মুখ নিচু করে হাসছে পাজিটা !

সবে তন্দ্রাটি এসেছে কি আসেনি, টেলিফোনের ঘণ্টা শুনে চোখ খুলতে হলো।

জয়ন্তী বললে, এত রাত্রে কার আবার ফোন করতে সাধ গেল ?

—উঠে ধরোনা লক্ষ্মীটি, নিশ্চয় রং নাম্বার হবে।

উঠে গিয়ে পাশের ঘরে ফোনটা তুললে। কার সঙ্গে কথা বলছে বুঝতে পারলুম না, গলাটা খুব বিস্ময়ের বলে মনে হলো।

ফিরে এসে বললে, তোমাকেই ডাকছে। মেডিকেল কলেজ থেকে ফোন করছে।

—তার মানে ? ধড়মড় করে উঠে বসলুম।

শুনি, এস. মজুমদার নামে এক ব্যক্তিকে গুরুতর ভাবে প্রহৃত অবস্থায় আনা হয়েছে ওখানে। এখনো চৈতন্য ফেরেনি।···পকেট ডায়েরি থেকে তাঁর নিজের নাম এবং আমার ফোন নম্বর পেয়েছেন ওঁরা।

জয়ন্তী বললে, কি করে কি হলো বলতো ? তোমার কিন্তু যাওয়া দরকার এখুনি।

—নিশ্চয় ! এখুনি বেরুচ্ছি আমি।

—কিন্তু যাবে কিসে ? বাস তো নেই এত রাত্রে।

দেখি ঘড়িতে এগারোটা বাজতে সতেরো। বললুম হ্যাঁ, অন্তত আমাদের এদিকে তো নয়ই।

একটু ভেবে ও জবাব দিলে, কাজ করলে হয় এক। একটা ফোন করে দাও আমাদের বাগবাজারে, গাড়িটা এখানে পাঠিয়ে দিক ওরা।

প্রস্তাব উত্তম। তবে সমীর হয়তো আমার আগেই খবর পেয়েছে। চলে গিয়েও থাকতে পারে এতক্ষণে। আমার ফোন নম্বর যে কালে রয়েছে মজুমদারের ডায়েরিতে তোমার দাদারটাতো থাকবেই।

—নাও থাকতে পারে। আমাদের ফোন নতুন এসেছে, ডাইরেক্টরিতে নাম ধাম ওঠেনি এখনো, তাই হয়তো নম্বরটা টুকে রেখেছিলেন সুনন্দন বাবু।

সমীরকেই পাওয়া গেল ফোনে। সব কথা শুনে ও একেবারে হতবাক! দুঃখও করলে খুব! ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বলে দিলে। তবে নিজে ও বেরুতে পারবে না, জ্বরের মতো হয়েছে। বললে কাল সকালে অবশ্যই খবর নেবে।

মেডিকেল কলেজের ফটকে ঢুকলুম। রাত তখন সাড়ে এগারো হয়ে গিয়েছে।

একটু এগোতেই নজরে পড়লো আবছা চাঁদের আলোয় ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাঁশরী।

—বাঁশরী তুমি ?

—কি হবে অনীশদা ?

—তুমি খবর পেলে কি করে ? চলো ভেতরে যাই, দেখি।

এমারজেন্সি ওয়ার্ডের সামনা সামনি পৌছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ও। বললে, আপনি একা যান, ভয় করছে আমার!

সেই কথাই আমিও ভাবছিলুম, কি করে আটকানো যায় ওকে।

ঠোঁট দুটো দেখি একেবারে পিসের মতো ফ্যাকাসে, এই প্রচণ্ড গরমেও কাঁপছে মৃদু মৃদু।

বললুম, সেই ভাল। তুমি বরং আলোর নিচে এই বেঞ্চটিতে বোসো। আমি খবর নিয়ে আসি!

—দেরি করবেন না তো?

—না না, যাবো আর আসবো।

ফিরতে কিন্তু দেরিই হয়ে গেল।

যেখানে বসিয়ে গিয়েছিলুম ওকে সেখানে নেই বাঁশরী। খুঁজতে খুঁজতে দেখি একেবারে গেটের ধারে দাঁড়িয়ে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো আমায় দেখে।

—ভয়ের তেমন নেই কিছু, ভালই আছেন সুনন্দন বাবু।

—সব বলুন আমাকে, বাদ দেবেন না কিছু।

—না বাদ দেবো কেন, শোনো তবে বলি। অবস্থা এখন আগের মতো অতটা শঙ্কাজনক নয়, যদিও গুরুতর নিশ্চয়! চোট খেয়েছেন অনেকগুলো। তার মধ্যে মাথার বাঁদিকের একটাই প্রচণ্ড। বাঁদিকের চোখটিতো রক্ষা পেয়ে গেছে নিছক ভাগ্যক্রমে।...রক্তপাত অতিরিক্ত হওয়াতেই ডাক্তারদের চিন্তা, বেশ কিছু নতুন রক্তের প্রয়োজন ছিল।

—নিয়ে চলুন আমায় ভেতরে, আমি দেবো যা রক্ত দরকার।

কাঁধে হাত রেখে বললুম, ভেতরে কি হচ্ছে তোমার বুঝি আমি। কিন্তু অত উতলা হলে কি চলে? সবটা শোনা আগে! তাছাড়া রক্ত দিতে চাইলেই কি দেওয়া চলে? আমিও তো চেয়েছিলুম দিতে। গ্রুপিংএ মিললো না। শুধু তাই নয়, পরিমানেও অনেক খানি দরকার।

—নিয়ে চলুন কোথা যেতে হবে, আমার রক্ত নিশ্চয় মিলবে!

—আবার পাগলামি করে! বলছি শেষ পর্যন্ত শোনো আগে। সংগ্রহ হয়ে গিয়েছে রক্ত, দেওয়াও হয়ে গিয়েছে।…এই সব কাজের জন্তে আলাদা একটা ভাঁড়ার থাকে হাসপাতালে, জানো তো? শুধু গুণ্ডা আর বদমায়েসেই ছেয়ে আছে পৃথিবী এমন তো নয়! ভাল লোকও অনেক, সংখ্যায় তারাই বেশি বরং। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের রক্ত জমা রেখে যান এখানে, যদি অন্তের আপদে-বিপদে কাজে লাগে!…তুমি আমিও বরং সুনন্দন বাবু সেরে উঠলে কিছু রক্ত দিয়ে যাবো এখানে ব্লাড-ব্যাঙ্কে, কেমন?

উৎকণ্ঠা মেশানো স্বরে ও বললে, ছোট সায়েবের জ্ঞান কি ফেরেনি এখনো? দেখা করা যায়না একবার ওঁর সঙ্গে?

—অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরতে পারে, এই তো ডাক্তার বাবুদের আশা। তবে সাক্ষাৎ করার অনুমতি আজ অন্তত মিলবেনা। দেখাই যাক কি হয়, এসো ততক্ষণ বসি একধারে।…কাণ্ডটা ঘটলো কি করে তুমি জানো কিছু? এখানে তুমি এলেই বা কেমন করে?

—আমি রাত্রে বাড়ি ফিরে শুনি! ট্যুইশনি সেরে ফিরতে খুবই দেরি হয়ে গিয়েছিল আজ। গলির মুখের গ্যাসটা দু তিন দিন ধরে খারাপ হয়ে রয়েছে। ভেতরে ঢুকে দেখি পরপর আরও কটি গ্যাস নেভানো, সারা গলি অন্ধকার। রহমতের পান-বিড়ি-সোডার দোকান থেকে এক চিলতে আলো পড়ে রাস্তায়, তারও আজ অসময়ে ঝাঁপ ফেলা! দু-দুটো লাল পাগড়ি বীরদর্পে টহল দিচ্ছে এধারে ওধারে। মনে হলো কি যেন অঘটন একটা ঘটে গিয়েছে পাড়ায়!

ছমছমে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে বাড়ি ঢুকলুম। চাবি খুলে ঘরের আলোটি জেলেছি কি জালিনি রমেন এসে খবরটা দিলে।—খুব জখম

মতন যে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন মাঝে মাঝে তাঁকে নাকি একটু আগে ভীষণ ভাবে মেরেছে কারা!···শুনলুম, সন্ধ্যের দিকে আরও একবার গিয়েছিলেন আপনারা আমার বাসায়। দ্বিতীয়বার উনি বোধ হয় একাই ছিলেন?

বললুম, তারপর?

—এ্যাম্বুলেন্সে তোলার সময় রমেনও শুনলুম গিয়েছিল ভিড়ের মধ্যে। পুলিশ ডেকে ডেকে সাক্ষী জোগাড় করছে দেখে পালিয়ে আসে। সবাই নাকি তখন বলাবলি করছিল লোকটা বোধহয় বাঁচবেনা আর।··· ওর কথা শুনে হিম হয়ে গেল অঙ্গ আমার। তখুনি বেরিয়ে পড়লুম। প্রথমে গেলুম আর-জি-করে। ওরা বললে, এ নামের এবং এ ধরণের কোন কেসই আজ ওখানে আসেনি। তবে ওরাই দয়া করে এখানে ফোন করে খবরটা জানালে আমায়। তারপর এখানে এসে যদি বা পৌঁছুলুম, ঢুকতে আর সাহস পাইনা কিছুতে। অপেক্ষা করছিলুম কখন আপনি আসবেন।

—কি করে জানলে আমিও খবর পেয়েছি এ নৃশংস ঘটনার?

—আপনার ওখানেও ফোন করেছিলুম যে। বৌদি বললেন, সেইমাত্র বেরিয়ে পড়েছেন আপনি, এখানেই আসবেন।

প্রায় শেষ রাত্রে জ্ঞান হলো মজুমদারের।

আমরা যখন হাসপাতালের ফটক পেরিয়ে বাইরে এলুম, ভোরের কাকেরা তখনো বাসা ছাড়েনি।

ফিরতি পথে বাঁশরীকে শুধোলুম, ও বাসা ছেড়ে দেবারই তো কথা তোমার আজকালের মধ্যে, নাইবা আর নামলে ওখানে? চলো বরং আমার বাড়িতেই নিয়ে যাই তোমায়, জিনিসপত্র ডেয়ো-ঢাকনা পড়ে

থাকে থাক, পরে নিয়ে গেলেই চলবে। তোমার থাকার জায়গা নিয়ে সুনন্দন বাবুকেও খুবই উদ্বিগ্ন দেখেছি কাল।

বাঁশরী জবাব দিলে, হ্যাঁ, ছোট সাহেবের খুব ইচ্ছে মাঝের এই দিন কটি ওঁর হোটেলেই থাকি আমি। ম্যানেজারকে বলে-কয়ে এক খানা ঘরও খালি করিয়ে রেখেছেন। আমিই রাজি হইনি। বলেছি, ভাল দেখাবেনা তা।···এখন ভাবছি হাসপাতাল থেকে উনি না ফেরা পর্যন্ত ঐ হোটেলেই থাকি। ওখান থেকে মেডিকেল কলেজ খুব কাছে পড়ে।

·· তাই হবে তবে! কলেজ যাবার আগে ওখানে গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা কয়ে নিলেই চলবে।

সলজ্জ হেসে উত্তর দিলে, সে-সব ঠিক করাই আছে। আমিই কেবল রাজি হইনি এতদিন।···কিন্তু কারা একাজ করলে বলুন তো অনীশদা, অমন মানুষেরও শত্রু থাকে?

—শত্রু কার নেই বলো? ইতিহাসে ওই নামে একজন রাজা ছিলেন, নইলে অজাতশত্রু কথাটা নিছক আভিধানিক একটা শব্দ মাত্র! বাস্তবে ওর কোন অর্থ কোনদিনই নেই।

—যাই হোক, আমিও যে এর মধ্যে জড়িয়ে রয়েছি তাতে কোন সন্দেহ নেই, নইলে আমারই পাড়াতে অমন কাণ্ড ঘটবে কেন?

বললুম, তুমি তো শুনেছো কাল সন্ধ্যায় আরও একবার গিয়েছিলুম তোমার ওখানে আমরা দুজনে।

জবাব দিলে, সেই রকম কথাই তো বলছিল রমেন, আমার কি শোনার অবস্থা ছিল তখন?

কাল সন্ধ্যার ঘটনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানালুম ওকে। বললুম, অতখানি বিবাদ বিসম্বাদের পরেও কেন যে আবার ওখানে গেলেন সুনন্দন বাবু সেইটেই বুঝতে পারছিনা কেবল।

—বোধ হয় আমার আস্তানার ব্যাপারে একটা বোঝাপড়া করতেই ফিরে গিয়েছিলেন আবার।

—নাও হতে পারে। হয়তো পাড়ার ঐ দলটা প্রতিশোধ নিতে পাছে তোমার ওপরেই কোন অন্যায় করে বসে সেই ভয়েই একটু পরে আবার গিয়ে ঢুকে ছিলেন গলিতে।

চুপ করে ভাবতে লাগলো ও।

হঠাৎ স্মরণে এলো, কালকের দলের ঘনা বলে লোকটিকে ঠিক কোথায় দেখেছি এর আগে। শুধু ঘনাই নয় দলের আর এক জনকেও দেখেছি ইতিপূর্বে। ঐ একই স্থানে।

বাঁশরীর বাড়ির সামনে নামিয়ে দিলুম ওকে।

এক আধটা ট্রাম বাস চলতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে।

ড্রাইভার দেব বাবুকে বললুম, আমাকে পাঁচমাথার মোড়ে নামিয়ে দিয়ে বাগবাজারে ফিরে যান আপনি। আপনারও রাত্রে ঘুম হলোনা কাল।

—আজ্ঞে, ও কিছুনা। আমি কাল সারা রাত গাড়িতেই শুয়ে শুয়ে ঘুম দিয়েছি মন্দ না, বিঘ্ন দিয়েছে শুধু যা মশার কামড় মাঝে মাঝে। কিন্তু দাদা বাবু যে বলে দিয়েছেন ফেরার সময়ে আপনি নিজে একবার দয়া করে নেমে সব খররাখবর দিয়ে যাবেন ওঁকে। আমার ওপরেও হুকুম আপনাকে একেবারে দমদমে পৌছে দিয়ে আসবার।

—চলো তবে। কথাও রয়েছে একটা।

ওদের বাড়ির সকলেই ভোরে ওঠে খুব। গাড়ির হর্ন শুনে নেমে এসে উৎকণ্ঠা মেশানো স্বরে সমীর বললে, খবর সব ভাল তো?

সংক্ষেপে জানালুম। কাল সন্ধ্যার ঘটনাটিও।

—কি করে এমন বিশ্রী কাণ্ড ঘটতে পারে বলতো ?

—তুমি কিছু জানানো ?

—আমি ?

—ভেবেছিলুম তোমার অজানা নয়। কাল সন্ধ্যায় প্রথম বার যাদের সঙ্গে বিবাদ হয় মজুমদারের তাদের দুজনকে আমি দেখেছি আগে। তোমারই বৈঠকখানায়। সেই ইলেকশন ক্যাম্পেনের সময়। এবারে মনে করতে পারছো কি ?

জবাব শোনার অপেক্ষা না করেই হন হন করে বেরিয়ে এলুম।

পরের দিন বিকেলে সমীরের এই চিঠিখানা এসে হাজির।

মাই ডিয়ার প্রফেসার,

কাল সকালে যে ভাবে যাত্রাদলের বীরের ভঙ্গীতে প্রস্থান করলে এখান থেকে, তারপরে এই চিঠি লেখার জন্যে বিন্দুমাত্রও উৎসাহ বোধ করছিনা। শুধু কয়েকটি বিষয়ে তোমাকে অবহিত করা প্রয়োজন।

সুনন্দন মজুমদারকে রেঙ্গুন থেকে নিয়ে আসি আমি এক বছরের কিছু বেশি হলো। তোমার খাতিরে বেকার মেয়েটাকেও আমিই কাজ দিয়ে রাখি অফিসে। দুটো কাজই আমার এ-পর্যন্ত জীবনের সব চেয়ে মারাত্মক ভুল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা দুজনে একক তথা মিলিত ভাবে ঘরে বাইরে উভয়ত যথেষ্ট ক্ষতি করে গিয়েছে আমার।

তাই বলে গুণ্ডাবাজি দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাতে যাবো এ তুমি কল্পনায় আনতে পারলে কি করে? এহেন অবস্থায় পড়লে তুমি নিজে বুঝি এই রকম কিছুই করতে তবে? নাকি, বাঁশরী এ কথা ঢুকিয়েছে

তোমার মাথায় ? তাহলে তো অতীব দুঃখের কথা, কারণ, বুঝতে হবে নিজের বুদ্ধি বিবেচনা সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে ওই মেয়েটার কথাতেই উঠছো বসছো আজকাল।

একশো বছর আগে হলেও না হয় ডুয়েল লড়ে ভাগ্য নিষ্পত্তির কথা ভাবা যেতে পারতো।…তাও তোমার ঐ বাঁশরী রায়ের জন্তে ? না ভাই, বিশ্বাস করো, মজুরি পোষাতো না। এখন বুঝেছি মেয়েটার মূল্য নিরূপণে গোড়ার দিকে ভুল হয়েছিল আমার। কথাটা স্পষ্ট করে লিখে প্রায়শ্চিত্ত করলুম এতদিনে। যদিও জানি, এই পর্যন্ত পড়েই তুমি সেই দ্রাক্ষাফল টকের মামুলি উপমাটা টেনে এনে মুখ মচকে হাসবে !

…একটা কথা ভালভাবেই জানো তুমি। মনোভাব গোপন করার মতো অভিনয় পটুতা কোনদিনই নেই আমার। রাগ হলে সেটা প্রকাশ করে তবেই আমি স্বস্তি পাই। ওসব দেঁতো হাসির ছলনা কিছুতেই আমার আসেনা।…সুনন্দন মজুমদারের বিশ্বাসঘাতকতা সেই সঙ্গে বাঁশরী রায়ের নিষ্ঠুরতা দুয়েরই প্রতিশোধ নেবার জন্তে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলুম আমি বলাই বাহুল্য। কিন্তু তা অন্য উপায়ে। আমি শুধু এইটুকুই চেয়েছিলুম যে, বাঁশরী তার হারানো শুভ বুদ্ধি ফিরে পাক। অজ্ঞাত কুলশীল ঐ ভবঘুরেটার (বিশেষণটি তোমাদেরই দেওয়া) মোহ জাল ছিঁড়ে মুক্তি আসুক নিজের। সেদিন দলের যে দুজন লোককে চিনে ফেলেছো বলে মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলে তুমি, স্বীকার করতে বাধা নেই, সামান্য যোগসূত্র ছিল আমার তাদের সঙ্গে। যখন জানতে পারলুম ঐ পাড়ারই আশে পাশে থাকে ওরা, ব্যবস্থা করেছিলুম, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে প্রতি নিয়ত তারা ক্ষত-বিক্ষত করে যেন বাঁশরীর বিবেককে, যার ফলে পরম কুশ্রী এই ব্যাপারটার সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে সে।

পরের দুর্ঘটনাটি বোঝাই যায় নিছক প্রতিহিংসা প্রসূত। তুমি নিজেই স্বীকার করে গিয়েছো মজুমদারই আগে হাত তোলে ওদের গায়ে। সম্ভবত তার শোধ নিতেই পাল্টা আঘাত খেতে হয়েছে তাকে। 'সম্ভবত' কথাটা ব্যবহারের কারণ, তুমি বা আমি কেউই সঠিক জানিনা, কাদের দ্বারা প্রহৃত হয়েছে মজুমদার! ও ধরণের লোকের পিছনে শত্রু লেগে থাকা অসম্ভব মনে করিনা আমি।

শেষ কথায় আসি। আমি যে ঘটনাচক্রে এ নাটকের প্রতিনায়ক হয়ে দাঁড়ালুম, আমার ভাগ্যের দোষ। কিন্তু তুমি যে কাল হাইকোর্টের মহামান্ত জজ সাহেবের মতো মুখ করে চলে গেলে এখান থেকে, মিলর্ড, এ আখ্যানে তোমার নিজের ভূমিকা কি ভেবে দেখেছো একবার? তুমি হলে এ গল্পের বিভীষণ, ঘরের শত্রু বিভীষণ। ইতি সমীর।

কদিন পরের কথা।

জয়ন্তী ও আমি সুনন্দন মজুমদারের হোটেলে গিয়ে পৌঁছুলুম,— তখনো বিকেলের আলোয় সোনালি রঙ মেশেনি। আজই সকালে মেডিকেল কলেজ থেকে ছাড়া পেয়েছেন উনি।

দরজা ভেজানো।

বললুম, আসতে পারি?

ভেতর থেকে কণ্ঠ শুনলুম, সুস্বাগত!

সঙ্গে জয়ন্তীকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলেন মজুমদার—কার মুখ দেখে চোখ খুলেছি সকালে, একসঙ্গে যুগল-মূর্তি দর্শন!

বিছানার ওপরে আধশোয়া হয়ে বসেছিলেন উনি। কপালের বাঁ দিক জুড়ে ব্যাণ্ডেজের একটি পট্টি এখনো জড়ানো। বাঁশরী বোধ হয়

কাছেই বসেছিল ওঁর, আমাদের সাড়া পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। মুখখানা হাসি হাসি, চোখের কোলে অথচ জলের দাগ শুকোয়নি এখনো! কাঁদছিলো না কি ?

আড্ডা জমতে দেরি হলোনা। আমি, বাঁশরী দুজনেই কথা বলি অল্প, ওদিকে জয়ন্তী তো বকম-বুড়ি আছেই, মজুমদারও বকতে পারে সমানে, দুজনে তুবড়ি ছুটোচ্ছে কথার।

বাঁশরীর দিকে ফিরে জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করলে, তোমার ঘর কি ভাই এর ঠিক পাশের খানাই ?

আমি স্মরণ করিয়ে দিলুম, কি যেন তুমি বলবে বলেছিলে সুনন্দন বাবুকে ?

—এই যে বলি। জানেন, বাঁশরীকে আজ নিয়ে যেতে এসেছি আমরা ?

—সে কি ?

—না তো কি! শুনলুম নাকি সাক্ষী ডেকে সরকারি খাতায় নাম সই দিয়ে আইনের বিয়েতে মত আপনাদের ? ওসব চলবেনা। পাঁজি-পুঁথি খুলে দিন-ক্ষণ দেখুন, পুরুত জোগাড় করুন, চেলি গরদে সেজে-গুজে টোপর মাথায় চলুন আমাদের বাড়ি, খোদ শালগ্রাম সাক্ষী রেখে বাঁশরীকে আপনার করে দেবো। উপরন্তু কানমলা দক্ষিণে।

বললুম, হোটেলের কথাও কি যেন একটা বলবে বলেছিলে ?

—থামো তুমি, সবেতে ফোড়ন কাটতে হবেনা। সে আমি ওঁকে সেই দিনই বলেছি। হোটেল মেস শুনলেই মনে হয় লক্ষ্মীছাড়ার আড্ডা।...এখন লক্ষ্মীর আগমন ঘটছে জীবনে, লক্ষ্মীর ঘর করুন আগে! এযুগের মেয়েরা কিন্তু সত্যি সত্যিই লক্ষ্মী, দুখানা রুমের ফ্ল্যাট হলেই খুশি হয়ে বরদানে রাজি!

পনেরো দিন সময় দিলুম আপনাকে সুনন্দন বাবু, কেমন?

সবিনয় ভঙ্গীতে মজুমদার উত্তর দিলেন, যথা আজ্ঞা!

বাঁশরীকে নিয়ে জয়ন্তী পাশের ঘরে গেলে শুধোলুম, ব্যাপার কি বলুন তো? একটু আগে ঘরে ঢোকার সময় বাঁশরীর চোখে যেন জলের আভাস দেখলুম?

—না, ও আপনার চোখের ভুল। কিংবা হলেও হতে পারে, তবে কান্না নিশ্চয় নয়, বোধহয় পান্না হবে।

—পান্না?

—বলতে পারলেন না তো? একেই বলে গুরু মারা চেলা। হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে এ কদিনে আপনার সেই সঞ্চয়িতা খানা প্রায় মুখস্থ করে ফেললুম যে!

মোটা গলায় হাত নেড়ে আবৃত্তি শুরু করলেন, "হাসি কান্না হীরা পান্না দোলে ভালে,"—

থামিয়ে দিয়ে বললুম, বুঝেছি সুখের কান্না। সেই গল্পটা শুনলে বুঝি?

এক মুহূর্ত নীরব থেকে মজুমদার উত্তর দিলেন।—না, এখনো বলিনি ওকে। ভেবে রেখেছি প্রথম মিলন-রজনীর শেষ প্রহরে বলবো!

পুনশ্চ

জয়ন্তীর কথা
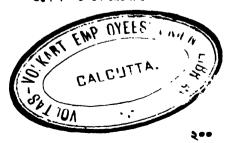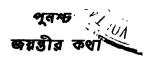
২রা শ্রাবণ, দমদম
১৩৬৪

ভাই কথক ঠাকুরপো,

গতবারে যেদিন গিয়েছিলুম আপনার ওখানে, রাত্রের খাওয়া সাঙ্গ করে ছাদে জ্যোৎস্নায় বসে আমরা কজনে, আপনার বন্ধু একটি গল্প বলে শোনালো। ওর শেষ হলে আমি অনুরোধ করলুম এই প্লটটি নিয়ে একটি কাহিমী রচনা করুন আপনি।

সাহাস্যে সে প্রস্তাব বাতিল করে দিয়ে আপনি মন্তব্য করলেন, আষাঢ়ে গল্পের আর দিন নেই, এ ধরণের গল্পে পাঠক-পাঠিকার মন ওঠে না আর।

তাই নয় শুধু, আমরা দুজনে এ আখ্যানের পাত্র পাত্রীদের সঙ্গে অল্প-বিস্তর জড়িত জেনেও বিনীত উপেক্ষার ভঙ্গীতে অনীশকে বললেন, তোমার এই কথামালায় একটি গিঁট এমন রয়েছে কোথাও যা কিনা নিতান্তই পলকা, যেকোন মুহূর্তে ছিঁড়ে গিয়ে বিপত্তি বাধিয়ে বসবে।

আপনার কথা শুনে সেদিন ভারি রাগ হয়েছিল আমার। আজ দেখছি আপনার ঠাকুরই কলা খেলেন শেষ পর্যন্ত! কি কুক্ষণে যে মুখ থেকে বের করেছিলেন ও কথা!

গোড়া থেকেই বলি।—মানে, যতটা আপনি শুনেছিলেন সেদিন, তারপর থেকে। ওরা দুজনে পরামর্শ করে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে নোটিশ দেবার দিন ঠিক করছিল, তা নাকচ করে সাবেকি দেশী

রীতির বিয়ের অনুষ্ঠানে রাজি করলুম ওদের, এইটুকু শুনেছিলেন আপনি।...বাঁশরী মাঝখানে এ কদিন ছিল আমাদেরই বাড়িতে। কারণ, এখান থেকেই বিয়ে হবার সব ঠিক, অনীশ কন্যাকর্তা।

গত রবিবার ওরা বেড়াতে গেল দীঘার উপকূলে, সমুদ্র দর্শনে। আমাদের দুজনকেও সঙ্গী হবার জন্যে সাধ্য সাধনা করেছিলেন সুনন্দনবাবু। অনীশ রাজি হলো না। বললে, আপনারা আগে ফিরে এসে রিপোর্ট দিন, পরের বার আমরা যাবো। দুজন দুজন করে যাওয়াই ভাল, নইলে ওখানে গিয়ে আপনারা দুষবেন আমাদের আমরা আপনাদের।...তাছাড়া অনীশ এখন ব্যস্তও খুব, এ মাসের গোড়া থেকে সপ্তায় দুদিন করে দারভাঙ্গা বিল্ডিংয়েও ক্লাশ নিচ্ছে ও।

ওরা দুজনে বেরিয়ে গেল ভোরে। ফিরলো রাত তখন দশটা। চেহারা যেন ঝড়ের পরে পাখি। সুনন্দনবাবু নামলেন না। বললেন, অত্যধিক দেরি হয়ে গিয়েছে। বাঁশরীও কারো সঙ্গে কথা-বার্তা বিশেষ না বলেই চলে গেল ভেতরে। একটু পরে ডাকতে গিয়ে দেখি দরজা বন্ধ, ভেতর থেকে খিল দেওয়া। জবাব দিলে, খাবেনা কিছু রাত্রে, মাথা ধরেছে ভীষণ।

ঠিক যেন বোঝা গেল না ব্যাপারটা। অনীশের ঘরে গিয়ে খাতা-পত্তরের বোঝা সরিয়ে কথাটা জানালুম। বললে, কিছু না, বোধহয় মান-অভিমানের পালা সেরে এসেছে এক পশলা।

খুব ভোরে ওঠা আমার বাপের বাড়ির অভ্যাস। পরের দিন উঠে দেখি আমারও আগে জেগেছে বাঁশরী। স্নান পর্যন্ত সেরে নিয়েছে

এরই মধ্যে। বাইরের বারান্দায় বসে কালকের পুরোনো কাগজখানা নাড়াচাড়া করছে।

বললুম, বাঁশরী ভাই সুপ্রভাত!

মাথা না তুলে জবাব দিলে, হুঁ।

—লক্ষ্মীমেয়ে, এরই ভেতর স্নানটুকুও সেরে নিয়েছ দেখছি।

—বড় নোংরা মনে হচ্ছিল নিজেকে।

—হবেই তো, কাল সারা দিন ঘোরাঘুরি হয়েছে তো কম নয়। তারপর? সমুদ্র দেখলে কেমন? একটু বলো শুনি!

—সুন্দর!

—সে তো জানিই। তবু গুছিয়ে বলো একটু। তোমার দাদা সেই কাল থেকে উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। কি না জানি বর্ণনা দেবে তুমি?

—আমি আর নতুন কি বলবো, আপনারা তো গিয়েই ছিলেন পুরী।

—কিন্তু কাগজে যে লিখেছে উড়িষ্যার সাগরে আর বাংলার সাগরে তফাৎ রয়েছে কিছু কিছু।

একটু চুপ করে রইল বাঁশরী। বললে, কি জানি, আমি কি অত-শত গুছিয়ে-বুঝিয়ে বলতে পারি? ঐ তো আলমারিতে বঙ্কিম রচনাবলী সাজানো, কপাল কুণ্ডলার আরম্ভেই কি আশ্চর্য সমুদ্র বর্ণনা!

থমকে দাঁড়ালুম। এমনি করে কাটা কাটা জবাব দেওয়া তো স্বভাব নয় ওর। বললুম, ঠিক করে বলো দেখি, কি যেন আজ হয়েছে তোমার?

—কই, কিছু তো হয়নি!

—দেখি তোলো একবার মুখখানা?

খোলা খবরের কাগজের লম্বা পাতায় মুখটা আরো নামিয়ে নিলে ও। জোর করে টেনে তুলতে গিয়ে ছেড়ে দিলুম। কাঁদছে!

…শুনলুম আদ্যোপান্ত। সমুদ্র মানুষকে অপার আনন্দ বিস্ময়ই দেয়না শুধু, বিহ্বলও করে তোলে সেই সঙ্গে। আর বিহ্বলতার আর এক মানেই দুর্বলতা। তেমনি দুর্বল এক মুহূর্তে যে অনন্ত কথাটি এতদিন সুগোপনে রেখে ছিলেন সুনন্দনবাবু এবং আমাদেরও রাখতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, প্রকাশ হয়ে পড়েছে। শর্মিলার সব কথা জেনেছে বাঁশরী।

তারপরেই নেমে এসেছে চরম বিপর্যয়। সে কাহিনী শুনে লজ্জা ঘৃণায় রি-রি করে উঠেছে বাঁশরীর অন্তরাত্মা। কাঁটা দিয়ে উঠেছে সর্ব গায়। এ কাকে নিজের হৃদয় মন সঁপে দিয়েছে ও, এ কার ভালবাসা ভরে নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে দুঅঞ্জলি পেতে? এ ভালবাসার জন তো তার আপন ধন নয়! সে তো শুধু উপলক্ষ্য কেবল, মাধ্যম মাত্র!…তারই দেহের আঙিনা দিয়ে বঁধু তার আনন্দ উপচার পাঠাবে কোন্ এক বিদেহীর মন্দিরে, এযে সহ্যাতীত নিষ্ঠুরতা, অপরিসীম প্রবঞ্চনা!…আঠারো বছর ধরে যে মানসীর সবটুকু স্মৃতি ঢেকে রেখেছে মানুষটা অন্তরের মণিকোঠায়, সব দুয়ার সব জানালা বন্ধ করে, তাকে সরিয়ে ঢুকবে কি করে ও? কোন্ পথ দিয়ে? কোন্ লজ্জায় সে চেষ্টাই বা করবে ও, পারবেই বা কেন! এ সতীন তো পর নয়, এ শত্রু যে সবচেয়ে আপন জন তার!

সেই ছড়ায় আছে না,—

> নিম তিতো, নিসিন্দে তিতো, তিতো মাকাল ফল
> তার চেয়ে তিতো কন্যা, বোন সতীনের ঘর!

কবি কল্পনাও ঐ বোন পর্যন্ত গিয়েই থমকে দাঁড়িয়েছে। তার বেশি ভাবতে পারেনি আর। কিন্তু এযে কল্পনার অতীত একেবারে। জঘন্য! এখানে সতীন যে ওর নিজের মা! মৃতা জননীর বিদেহী আত্মা!

আশাকরি বুঝতে পেরেছেন এবার? শর্মিলা বাঁশরীর পূর্বজন্মের নাম নয়, বাঁশরীও শর্মিলার জন্মান্তরের প্রতিরূপ নয়। বাঁশরী আসলে শর্মিলার আত্মজা! কন্যা!

রুদ্ধ নিশ্বাসে বললুম আমি, তা তো হতে পারেনা। নিশ্চয় কোথাও ভুল হয়েছে তোমার বাঁশরী। শর্মিলা যে বিয়ে হবার মাস কয়েকের মধ্যেই স্বর্গতা হয়েছিল শুনেছি?

মলিন হেসে ও জবাব দিলে। আমার মাকে চিনতে ভুল হবে আমার, তাও কি হতে পারে? তবে ছোট সায়েব ঐ ভুল খবরটা কোথা থেকে পেয়েছিলেন সেইটেই বুঝতে পারলুম না। মা আমার মারা গিয়েছেন সবে এই গত বছর।

ছুটে অনীশের ঘরে গেলুম, ঘুম থেকে নাড়া দিয়ে তুললুম। সব শুনে স্তম্ভিত হয়ে ও বললে, সেকি?

শুধোলুম, কি করে হয় এমন কাণ্ডটা? তুমি আমি কারোরই তো ধারণায় আসেনি এ ধরণের একটি বাস্তব সম্ভাবনার কথা?

—আসবে কি করে। সন্দেহের গোড়া যে আগেই মেরে রেখেছিলেন মজুমদার। বিয়ের মোটে চার-পাঁচ মাসের মধ্যে মারা গিয়েছে যে মেয়ে, তার তো আর মা হবার প্রশ্ন উঠতে পারে না!

—ভাবোতো কি ভীষণ দুর্ঘটনা!

কি যেন একটু ভেবে গম্ভীর হয়ে গিয়ে অনীশ উত্তর করলে, না, ঠিক দুর্ঘটনা বলা চলে না একে।···কিছুটা যেন অনুমান করতে পারি এখন। আমার বিশ্বাস সুনন্দন মজুমদারের পূজনীয়া জননীই এর জন্যে দায়ী সর্বতোভাবে।···সুদূর পূব বাংলায় শর্মিলা যে সময়ে সুখে-দুঃখে স্বামী-সংসার করছে, উনি স্বেচ্ছায় পুত্রকে তার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ

পাঠিয়েছিলেন। যেটুকু শোনা গিয়েছে তাঁর বিষয়ে, তাতে এ কাজ তাঁর চরিত্রে সম্পূর্ণ রূপে খাপ খেয়ে যাবারই সম্ভাবনা। একমাত্র সন্তানের ভবিষ্যত হিতের জন্যে সব কিছুই করতে পারতেন তিনি। নইলে, সদ্য স্বামীহারা মা নিজের কোলছাড়া করে ছেলেকে বাড়ি ছেড়ে পালাতে উৎসাহিত করছেন ভাবতে পারো তুমি? এ কি সহজ কথা? হয়তো তিনি ভেবেছিলেন যে বিষম দুঃখ-কীট দিনের পর দিন একটু একটু করে কুরে-কুরে খাবে ছেলের কাঁচা সবুজ মনকে, তাকে একটি মাত্র প্রবল শোক-বহ্নিতে তীব্র শিখায় জ্বালিয়ে দিয়ে, নিঃশেষে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। বিষের ওষুধ বিষ, এইটেই সহজতম পদ্ধতি মনে হয়েছিল তাঁর নিজের কাছে। ছেলেকে তাই মিথ্যে চিঠির শেষে মিথ্যে প্রবোধ দিয়েছিলেন, শোক করে লাভ নেই কোনো, কারণ, মৃত্যুর ওপরে তো হাত নেই কারো! আরও লিখেছিলেন, পেয়ে হারিয়ে ফেলার চেয়ে না পেয়ে হারানো অনেক কম দুঃখের!…কিছু ফল অবশ্যই হয়েছিল তাঁর সেই চিঠির, কারণ সুনন্দন মজুমদার স্বমুখে স্বীকার করেছেন, অনেক তীব্র বেদনার দাবদাহ-মুহূর্তে মায়ের সেই চিঠির কথাগুলি সান্ত্বনার প্রলেপ বুলিয়েছে ওঁর বুকের মধ্যে। …দুঃখের বিষয় শেষ রক্ষা হলো না।

—এখন উপায়?

—দেখিনা তো কিছু!

সত্যিই কোনো উপায় করা সম্ভব হলো না। পর পর কদিন দেখা নেই সুনন্দন বাবুর। যেদিন এলেন, শেষ বারের মতো দেখা করতে। কদিনে একেবারে নিভে গিয়েছেন ভদ্রলোক। গলার সেই উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দটা শুনলুম না একবারও।

বললেন, কি এক বিশ্রী ওলট-পালট করে দিয়ে গেলুম দুদিনের জন্যে এসে। বাঁশরী কি ক্ষমা করতে পারবে আমায় কোনদিন ?

অনীশের দিকে ফিরে বললেন, আপনার কথা রাখতে পারলুম না আমি, জয়ন্তী দেবী আপনারও না। বন্দরে নোঙর ফেলা আর হলো না জীবনে, চললুম আবার ভেসে। বহু পুরোনো কথা একটা নতুন করে মনে পড়ছে, এ জীবনে স্বপ্নের ঠাঁই নেই!

...বাঁশরীও চলে গেল স্কুলের সেই চাকরিটা নিয়ে। কাজটা ওর মঞ্জুর হয়েই ছিল। শুধু আমরা আটকে রেখেছিলুম এ কদিন। আর বাধা দেবো কোন মুখে? সেদিনের ঘটনার পরে সুনন্দনবাবুর নাম আর একটি বারের জন্যেও শুনিনি ওর কণ্ঠে। অথচ মেয়ের মন দেখুন! যেদিন গেলেন সুনন্দনবাবু অনীশ গিয়েছিল এয়ার পোর্টে ওঁকে বিদায় জানাতে। ফিরে এসে বললে, বাঁশরীকেও নাকি দেখেছে ওখানে, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল এক কোণে।

ভাবি তাই! কার দোষে এমনটা হলো!

সুনন্দন বাবুর শেষ কথাটাই বোধ হয় ঠিক। বিশ্ব হতে হারিয়ে গেছে স্বপ্নলোকের চাবি!

আপনি তো সেদিন গল্প শেষ হবার আগেই সব দোষ ওঁরই ওপরে চাপিয়ে দিয়ে গেলেন। বললেন, দীর্ঘদিন স্বজন-সঙ্গ-রহিত হয়ে একক-জীবন কাটাতে হয়েছে ভদ্রলোককে। বুকের জমিতে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার পলি পড়েনি কোনদিন! কাজেই বুভুক্ষু অন্তর খুঁজে মরছে নিরন্তর কোথায় গেলে পরে মনের মানুষ মেলে।...সেই সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে ওঁর নিভৃততম মনে নিকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠের যতগুলি কুফল। যে কোন অবস্থাতেই বই অতি শ্রেষ্ঠ বন্ধু মানুষের, সন্দেহ নেই!

কিন্তু বছরের পর বছর ধরে উনি পড়ে গিয়েছেন শুধু থ্রিলার আর এ্যাডভেঞ্চার, বাজে যত অলৌকিক রহস্য আর রোমাঞ্চ। নিজেকে এ বিষয়ে অথরিটি মনে করেন। অবস্থা এতদূর গড়িয়েছে, এখন আর কল্পিত নায়কের কীর্তিকলাপে মন ওঠে না। বাসনা একটি রহস্য কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন নিজেই।

অনীশ বলে যত দোষ সুনন্দন বাবুর মায়ের। তাঁর উদ্দেশ্য হয়তো সাধু ছিল, কিন্তু সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে ছিল মিথ্যের লুকোচুরি। অসত্যের ফল শেষ পর্যন্ত নাকি কোনদিনই শুভ হয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিছু মনে করবেন না, আপনার মন্তব্য একেবারে হৃদয়হীনের মতো লেগেছে আমার। অনীশের ঐ শিশুশিক্ষার নীতিকথাও স্পর্শ করেনা আমায়। তাছাড়া, সুনন্দন বাবুর ব্যর্থতার কারণ নিয়ে দুবন্ধুতে গবেষণা করেছেন তো খুব কিন্তু একটা প্রশ্ন করি, বাঁশরীর এই বেদনার জন্যে দুষবেন কাকে আপনারা? ও বেচারী কেন জড়িয়ে পড়লো এই ভাগ্য-সুতোর টানা-পোড়েনের অকরুণ জালে?

যাই হোক, আষাঢ়ে গল্পের ওপর ভারি রাগ আপনার, শ্রাবণের পালা শুনে খুশি তো এবার? প্রীতি নেবেন।

ইতি—আপনার
জয়ন্তী বৌদি